Hiteshranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 10	Place of Publication: Swasti Sahitya Sadan; (. Gourmohan Street, Calcutta.
Collection: Sharmadip Basu	Publisher: Nripendrakumar Basu
Title: *Jouna Vishwakosh* (Vol. 1, No. 1)	Year of Publication: June, 1938
	Size: 18 c.m. x 12 c.m.
Editor: Nripendrakumar Basu (1898 – 1979)	Condition: Good. Cover page missing.
	Remarks: Soft bound copy. Total pages: 96; Title page and content list are not included in numbered pages. Introduction by Amulyacharan Vidyabhushan.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

যৌন-বিশ্বকোষ

—প্রথম খণ্ড—

প্রথম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৫

জন্ম-শাসন, নর-নারীর যৌনবোধ, দুর্নীতির ইতিহাস, যৌবনের যাদুপুরী, প্রেম ও
কাম-বিজ্ঞান, History of Prostitution in India প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

সম্পাদিত

স্বস্তি সাহিত্য সদন

৯, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট্, কলিকাতা।

বার্ষিক (ছয় সংখ্যা) সডাক্ পাঁচ টাকা, প্রতি সংখ্যা বারো আনা।

YAUNA-VISVAKOSHA
(Sexual Encyclopedia in Bengali)
Edited & Published by
N. K. Basu
Vol. 1. No. 1. (June, 1938)
All rights reserved by the Editor.

—উপদেষ্টা-সংঘে—

ডক্টর **বিমানবিহারী মজুমদার,** এম-এ, পি-এইচ্-ডি, পি-আর-এস্
ডাঃ **রাসবিহারী ঘোষ,** এম-বি, ডি-টি-এম্
ডাঃ **শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ,** এম-বি
ডাঃ **সন্তোষকুমার মুখার্জী,** এম-বি
শ্রীযুত **ত্রিদিবনাথ রায়,** এম-এ, বি-এল্
„ **পি, ভট্টাচার্য,** অ্যাড্‌ভোকেট্
„ **শচীন্দ্রনাথ সরকার,** এম্-এ
প্রভৃতি বারো জন আছেন।

Printed by Paramananda Singha Roy
at SREE KALI PRESS
67, Sitaram Ghosh Street, Calcutta.

সূচীপত্র

১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা

ভূমিকা ...শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ... ।/০
মুখবন্ধ ৸/০
অবতরণিকা

প্রেমক্ষুধা সম্বন্ধে শিক্ষার অভাব—আদিম মানবের যৌনবিষয়ক কল্পনা—পুরাযুগে যৌন যথেচ্ছাচার—লিঙ্গচ্ছেদ—যোনি-পূজার ব্যাপকতা—যৌনাবেগ ও ধর্মভাব—দেব-সেবিকার উদ্ভব—মুশা ও ঈশার নৈতিক নিগড়—বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো—স্বামীরূপে ভগবান বা গুরুর অনুধ্যান—শিশ্নদেবতা ও বৃষধ্বজ—পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা—বাৎস্যায়নের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগ—শঙ্করের পরাজয়—বসনের জন্মকথা—বস্ত্রের প্রথম অবলম্বন কটি ও জঙ্ঘা—বসন ও লজ্জাশীলতা—পোষাকের যৌন আবেদন—বক্ষের মূক ভাষা—যৌনবৃত্তির আধুনিক পরিণতি—স্ত্রীলোকের যৌনবিষয়ক ব্রীড়া—সাধুর অন্তরের প্রতিচ্ছবি—চূড়ান্ত অজ্ঞতা ও তাহার কুফল—প্রেমাতঙ্ক রোগের লক্ষণ ও নিদান—চিকিৎসকের মূর্খতা ও নিশ্চেষ্টতা—গুরুর আসনে কবি ও সাহিত্যিক—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের যুগ—অসম্পূর্ণ ও অতিরঞ্জিত চিত্র—চাই প্রেমের সম্পূর্ণ রূপ—উদ্দাম আতিশয্যের হেতু—কৃষ্টির গণতান্ত্রিকতা—দুর্নীতি সেকালে ও একালে—স্ত্রী-স্বাধীনতা এদেশে ও বিলাতে—যুগপ্রগতিতে বৃথা বাধাদান—হাতে-কলমে শিক্ষার ফল—বালকবালিকাদিগের অকাললব্ধ যৌন-জ্ঞান—জ্ঞানলাভের

সনাতন পন্থা—আদিম জাতিদের যৌনজ্ঞানে দীক্ষা—অস্ট্রেলিয়ায় —আফ্রিকায়—দ্বিতীয় বিবাহের উৎসব—কাদার সার্থকতা—যৌনজ্ঞানে সাহিত্যের সহায়তা—প্যাণ্ডোরার বাক্স—উপন্যাস, পুরাণ প্রভৃতির অংশ—বাইবেল প্রেমাত্মক পাঠ্যপুস্তক—অনভিপ্রেত অজস্র শিক্ষার প্রণালী—বিদ্যালয়ে যৌনবিজ্ঞান শিক্ষা—সহজপাঠ্য যৌনবিজ্ঞানের পুস্তকাবলী—বাংলাদেশে গ্রন্থদৈন্য—যৌন-বিশ্বকোষের পরিকল্পনা ... ১—৫৮

১। জীব-জীবনের বিবর্তন

বীজাণু—আদিম জলজ শৈবাল—কোষাণুর পরিচয়—প্রজীব—অম্বাণু—বহু কোষাণুযুক্ত জীব—বিবর্তনবাদে মতবৈষম্য—ডারউইনের মতবাদ-বৈশিষ্ট্য—আত্মসংস্থানের দ্বন্দ্ব—প্রাকৃতিক নির্বাচন—আকস্মিক বৈষম্য—মানুষের উৎপত্তি ... ৫৯—৭৩

২। জীবগণের বংশবিস্তারের ধারা

মৌলধাতুর উপাদান—জীবাণুদের জীবন-ধারণ-পদ্ধতি—বংশরক্ষার আয়োজন—এককোষাণু জীবের জন্মদান-পদ্ধতি—প্রজীবের জীবন্ত উপনিবেশ—পরিস্ফুরণ-ক্রিয়া—আদিম বহু-কোষাণুযুক্ত জীব—যৌন-প্রজনন-পদ্ধতি—যৌন-পদ্ধতির সুবিধা —যৌন প্রজননের বৃহত্তর উদ্দেশ্য—একপাত্রে যৌন ও অযৌন প্রজনন—জীবনের সংজ্ঞানির্দেশ—অপৈত্রজনন—সবুজ মাছির জনন-রীতি—মধুমক্ষিকার জনন-রীতি—কৃত্রিম অপৈত্রজনন—উদ্ভিদ্‌রাজ্যে বংশবিস্তার-রীতি —পাটা-শেওলার যৌন মিলন—যৌনধর্মের দৈহিক বৈশিষ্ট্য—পক্ষিকুলের স্ত্রী-পুরুষ—পুরুষের দৈহিক শক্তি ও সৌন্দর্য—অণ্ডাণু ও শুক্রকীটাণুর সংযোগ-সাধন—বংশরক্ষার আয়োজনে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য—উচ্চতর প্রাণীর অণ্ডাণু ও শুক্রাণু—মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বাস ... ৭৪—৯৬

——০——

ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

'মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ শাসন করিলেন, "অস্মিন্ শরীরে কিং কামোপ-ভোগৈঃ"—এই দেহে কামোপভোগ করিয়া কি ফল? আরও বলিলেন, "অস্মিন্ সংসারে কিং কামোপভোগৈঃ"—এই সংসারে কাম উপভোগ করিয়াই বা কি লাভ? সত্যই কোন লাভ নাই, কেন না কামোপ-ভোগের ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হইবার নহে। তথাপি লোকে শত-শত আশা-পাশে আবদ্ধ হইতেছে; দুনিয়ার সকল আনন্দ লুণ্ঠন করিবার আকাঙ্ক্ষায় ছুটাছুটি করিতেছে। "কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ। আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্।" (গীতা, ১৬ অ, ১১-১২ শ্লোক)।

কিন্তু মানুষ তো বিষয়লিপ্সা ছাড়িতে পারে না। বাসনা, কামনা, তাহার মনকে এমনি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে যে, তাহার হাত হইতে মুক্তির সে কোন উপায় করিতে পারে না। সে কামিনী, কাঞ্চন, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠার জন্য অহরহঃ ঘুরিয়া হয়রান্ হইতেছে। সে চায় সুখ। "সুখং মে ভূয়াদ্, দুঃখং মে মাভূৎ।" কিন্তু জানে না সে— "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।" তাহার মধ্যে যে সুখের অফুরন্ত উৎস বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার সন্ধান না লইয়াই সে সুখের অন্বেষণে নানাদিকে ছুটিয়া থাকে। হরিণ সুগন্ধে বন আমোদিত দেখিয়া সুগন্ধের উৎস খুঁজিবার আশায় বনের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়, কিন্তু হতভাগ্য

হরিণ জানে না যে, তাহারই নাভি-কস্তুরীর গন্ধে বন আমোদিত করিয়াছে! "নাভিকা স্বগন্ধ মৃগ নহী জানত, ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই।"

তাই মানুষের গতি ফিরাইবার জন্য কৌশল করিয়া শাস্ত্রকার বলিলেন, "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ"। পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত যথাযোগ্য বিষয় ভোগ কর, তারপর তোমাকে ভোগের পথ ছাড়িয়া ত্যাগের অনুসরণ করিতে হইবে। তাহাতে তুমি অমৃতত্ব লাভ করিবে। "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ব-মানশুঃ।" দেহ ও মনের মধ্য দিয়া তাহাতেই সুখের প্রকৃত উৎস খুঁজিয়া পাইবে। এই অনুসন্ধানে—"ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।" ভোগের মধ্যে যতদিন তুমি থাকিবে, ততদিন যথাযোগ্য ধর্ম, অর্থ ও কামের সাধন করিবে; অতঃপর, ত্যাগের পথে তোমার সাধ্য হইল 'মোক্ষ'। এই মোক্ষসাধনের মধ্যে তোমার আবার নূতন রকমের ভোগ আসিবে। সে বিষয়াতীত—ইন্দ্রিয়াতীত ভোগের বস্তু। তাহার আস্বাদন অপূর্ব।—ঋষি বাদরায়ণ 'ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ' সূত্রে এই আস্বাদনের কথাই বলিয়াছেন।

আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ বলিয়া প্রচারিত। অথচ আমরা যখন ধর্মানুষ্ঠানাদি করিয়া থাকি, তখন আর একটা উপদেশ আমাদের মনে জাগিয়া থাকে। সেটী হইতেছে—'কাম-কাঞ্চন' বা 'কামিনী-কাঞ্চন' ত্যাগের কথা। পুরুষার্থের যদি সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে কিন্তু ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষেরই সাধন করিতে হইবে। শিষ্টগণ যে আচরণ করেন, বৈদিক সাহিত্যে তাহাই কর্তব্য বা ধর্ম বলিয়া গৃহীত। বেদে 'ধর্ম' শব্দ একশত ছাপান্ন বার আছে এবং সেই ১৫৬ বার প্রযুক্ত শব্দের অর্থ সর্বত্রই—সদাচার। তখনকার দিনে যজ্ঞানুষ্ঠান ঐ সদাচারেরই অন্তর্গত ছিল। দর্শনশাস্ত্রে

বার বার বলা হইয়াছে যে, যদি মোক্ষ লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটীর সাধন করিতেই হইবে।

মানুষকে জগতে থাকিতে হইলে এই তিনটীর সাধন-পদ্ধতি ও প্রকরণ বিশেষরূপে শিক্ষা করিতে হইবে। এইজন্যই আমাদের ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ও কামশাস্ত্র। ইদনীন্তন লোকেরা কার্যতঃ না হউক বাহ্যতঃ ধর্মশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী; অর্থশাস্ত্রও যে তাঁহারা না চান তাহা নহে; কিন্তু কামশাস্ত্রের যথোচিত অনুশীলন যেন একটা অন্যায় কর্ম—অপকার্যের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। সুপ্রাচীন কাল হইতে বৈদিক সাহিত্য, সূত্র-সাহিত্য, স্মৃতি ও পুরাণ-সাহিত্যে কামশাস্ত্রের আলোচনার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। তখনকার সময়ে এমন গৃহস্থ ছিল না, যাহাকে অন্যান্য বিদ্যার সহিত এই কামশাস্ত্রের আলোচনা না করিতে হইত। শাস্ত্রে বলিয়াছে—ধর্মার্থে পুত্রোৎপাদন করিবে; সঙ্গে সঙ্গে কি কি আচার ও আচরণের দ্বারা তাহা সম্পাদন করিতে হইবে তাহারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও স্বাস্থ্য-সম্মত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

দেখা যায়, 'বিলাস-কলা' বলিয়া একটা শাস্ত্র পূর্বে প্রচলিত ছিল; ইহারই অন্তর্গত ছিল কামকলা। বিলাস-কলা বলিতে বিলাসিতার অনুষ্ঠান বুঝাইত না, একটী স্বতন্ত্র শাস্ত্রই বুঝাইত। জয়দেব বলিয়াছেন—'যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্। মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥' এখানে এই বিলাস-কলাকে ধর্ম্য অনুষ্ঠান বলিয়া টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সমস্ত এবং এইরূপ শাস্ত্রীয় আলোচনার দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, কামশাস্ত্রের আলোচনা নিরর্থক বা অনর্থক নহে।

বিধাতা যখন সৃষ্টির প্রথম বিধান করেন, তখন কাম তাঁহা হইতে

প্রস্থত হইয়াছিল। "তদঙ্গস্থ্যতকামাৎ জগদিদং সঞ্জাতম্"। একটা সাদা কথা 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত হইয়াছে, "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।" এই কাম ও প্রেমে ধাতুগত বিভিন্নতা নাই। আধারের তারতম্য অনুসারে ইহার 'ব্যাপারের' এত পার্থক্য ঘটিয়াছে। স্বাতী-নক্ষত্রের জল যদি শুক্তিতে পড়ে, তাহা মুক্তা হইয়া যায়; কিন্তু নর্দামায় পড়িলে তাহা নর্দামারই মলিন জল হইয়া থাকে। আধারের বৈশিষ্ট্যে প্রকারের বৈশিষ্ট্য হয়।

জগতে এমন জীব নাই, যাহার কামপ্রবৃত্তি নাই। এই প্রবৃত্তির সার্থকতার জন্য আমাদের হৃদয়ে একটা প্রেরণা যৌবনের প্রাক্কালেই উদিত হইয়া থাকে। এই প্রেরণা আছে বলিয়াই মানব-চিত্ত এতটা স্নেহ-প্রবণ। এই প্রেরণাই আবার তীব্র হইয়া ক্রমশঃ তীব্রতর—তীব্রতম হইয়া উঠিলে, চিত্ত অতিশয় স্নিগ্ধ হয়। এ অবস্থায় তখন তাহা ভাবরূপে পরিণত হয়। আর সেই ভাব গাঢ়তাপন্ন হইয়া, শত-উচ্ছ্বসিত হইয়া যাহা সৃষ্টি করে, তাহাই যুবজনের ভালবাসা। ইহাকে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার "উজ্জ্বল নীলমণি"তে বলিয়াছেন—

সর্বদা ধ্বংস-রহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্‌ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ।

ইউরোপের এক শ্রেণীর কাম-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন যে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ছদ্মবেশে কাম-পরিচর্যার সূচনা হইয়া থাকে। একথা কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া কঠিন। শারীর ও মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিলে, ইহার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ খাড়া করা যাইবে। জীবনের একটা সময় আছে যখন জীব স্বতোৎসারিত কামো-

দ্দীপনার বশীভূত হইবেই হইবে। ইহা তাহার অর্জিত বিলাস-বাসনা নহে, প্রজা-সৃষ্টির স্বাভাবিক সহজাত প্রেরণা। সৃষ্টি করিতে হইলে ইহার সার্থকতা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি সৃষ্টির পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, মানুষ যদি এই বৃত্তিকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে শতাধিক বর্ষ পরেই জগৎ হইতে মানুষের অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে—"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ", অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না, তখন একমাত্র অদ্বিতীয় এই ব্রহ্মই ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি আনন্দ আস্বাদন করিলেন। কেন করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু তিনি একাকী আনন্দ আস্বাদন করিতে পারিলেন না। বৃহদারণ্যক তাই বলিয়াছেন—'স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে।' তাই তিনি তখন 'স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ—স হৈতাবানাস যথাস্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং…… ততো মনুষ্যো অজায়ন্ত'। ইহাই হইল সৃষ্টির দ্যোতনা। তাই তাঁহার সৃষ্ট তাঁহারই ধাতুলিঙ্গ মানুষে সৃষ্টির লিপ্সা—লৌকিক প্রেমের বিকাশ।

এই প্রেম উপলক্ষ হইয়া অনেক সময় মানব-মনে আসঙ্গলিপ্সা উদ্রিক্ত করে। ইহা লইয়া দেশ-কাল-পাত্র ভেদে যে যে অবস্থা ও অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা যৌনতন্ত্রের আলোচ্য বিষয়। অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকায় বিদ্বন্মণ্ডলীর অনেকে এই শাস্ত্র লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন। সাধারণের ধারণা, পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে সকল অনুশীলন হইয়াছে ও হইতেছে, সেগুলি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও ন্যায়বিজ্ঞান-সম্মত। এ সমস্ত আলোচনায় যে, অনেক সংবাদ পাওয়া যায় এবং

বহু নূতন সত্যও উদ্ঘাটিত হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু "all that glitters is not gold."

এই প্রসঙ্গে আমার একটী নিবেদন এই যে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কামশাস্ত্র বা যৌনশাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর ও বহুমুখী গবেষণার পরিচয় আছে। সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে দেহ ও মনস্তত্ত্বের এত নূতন, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্ব উদ্ধার করিতে পারা যায় যে, তদ্দ্বারা বর্তমান যৌনতত্ত্ব-লেখকগণের বহু সাহায্য হইতে পারে। এ সম্বন্ধে সংস্কৃতে কত শত গ্রন্থ যে লিখিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; এখনও ন্যূন সংখ্যায় চারি-শতেরও অধিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলির অধিকাংশই সুচিন্তিত, সুপরীক্ষিত ও মনস্তত্ত্বের অপূর্ব বিশ্লেষণ-বিভূষিত। পাশ্চাত্য গ্রন্থের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এইগুলিরও তুলনামূলক আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

এইকথাগুলি বলিবার প্রয়োজন হইল শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রকুমার বসুর "যৌন-বিশ্বকোষের" সূচনা দেখিয়া ও তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিরাট্ পরিকল্পনার কথা শুনিয়া। 'যৌন' শব্দটী সূত্র-সাহিত্যে, মনুসংহিতা ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে কয়েকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎকালে উহা 'বিবাহ সম্বন্ধ' এই অর্থেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। তারপর উহা 'যোনি-সম্বন্ধীয়', যোনি-জাত' অর্থাৎ 'গর্ভবিষয়ক' এই ব্যাকরণসম্মত অর্থে সংস্কৃত শাস্ত্রের কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হইয়াছে। "বিশিষ্টা চ ষষ্ঠী-স্থানে যোগা—" এই সূত্র অবলম্বন করিয়া পতঞ্জলি তাঁহার 'মহাভাষ্যে' (১.১.৪৯) বলিয়াছেন, "লোক সমাজে অনেক সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন আর্থা, যৌনা, মৌথা, স্রৌবা।" এখানে 'যৌন' শব্দের অর্থ যোনিগত বা পিতৃমাতৃ-সম্বন্ধগত। বিবাহ বা বিবাহ-সম্বন্ধার্থে 'যৌন' শব্দের

প্রয়োগ "শ্রীমদ্ভাগবতে" (১০.৬১.২৫) পাওয়া যায়—"জানন্নধর্মং তদ্ যৌনং স্নেহপাশানুবন্ধন।" আবার একস্থলে (১০.৬৮.২৫)" দেখিতে পাই—"এতে যৌনেন সংবন্ধাঃ সহশয্যাসনাশনা।" ১০ম স্কন্ধে, ৮৩ম অধ্যায়ে ত্রিংশৎ শ্লোকেও যৌন শব্দের আর একবার উল্লেখ আছে। মহাভারতে ও হরিবংশেও এই শব্দটির একাধিকবার ব্যবহার রহিয়াছে।

বর্তমানে বাঙলা ভাষায় যৌন শব্দটির অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'যুবক-যুবতীর পরস্পরের প্রতি প্রেমাচরণ।' ইহা এক্ষণে বিশেষ্য ও বিশেষণ এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যাপকভাবে ইহা 'বিলাস-কলা', 'দাম্পত্য বিজ্ঞান', 'সৌজাত্য-বিজ্ঞান' প্রভৃতি ও তৎসম্বন্ধীয় অনেক কিছু ব্যাপারই বুঝায়, এবং এরূপ ব্যবহার সুষ্ঠু, সঙ্গত ও ব্যাকরণ-সম্মত মনে হয়।

জগতে যেমন বহু বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা আছে, এই বিশ্বকোষেরও একটা বিশেষ সার্থকতা ও বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। যে উদ্দেশ্যে প্রাচীন আর্যঋষিগণ কামশাস্ত্রের আলোচনামূলক গ্রন্থাদি সঙ্কলন করিয়া-ছিলেন, সম্ভবতঃ সেই একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া বর্তমান সঙ্কলয়িতা এই বিশ্বকোষ প্রকাশ ও প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রাচীন কামশাস্ত্রে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে কামচর্যার নানা ব্যবস্থা-প্রণালী অভ্যাসের বিবৃতি আছে। নৃপেন্দ্রকুমার তাঁহার অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ বর্তমান কালের উপযোগী করিয়া, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে—বিশেষভাবে ভারতবর্ষের নানা জাতির মধ্যে নৈতিক অবস্থা, বিবাহ-নীতি, যৌন-জীবনের রীতি ও পদ্ধতি তাঁহার এই বিরাট্ বিশ্বকোষে একত্রীভূত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

তাঁহাকে যাঁহারা পরামর্শ দিবার এবং প্রবন্ধাদি দিয়া সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি এবং তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের উপর আমার যথেষ্ট আস্থা ও শ্রদ্ধা আছে। নৃপেন্দ্রবাবু ইতিপূর্বে যৌনসম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন এবং বিদ্বন্মণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। বিদেশী বহু গ্রন্থ তাঁহার পড়াশুনা আছে, এবং স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি ও কঠিন বিষয় প্রাঞ্জল করিয়া বলিবার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী তাঁহার আছে। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু। আশা করি, তিনি জয়যুক্ত হইবেন। ইতি

কলিকাতা।
৩রা আষাঢ় ১৩৪৫।

মুখবন্ধ

কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও কলার দিক্ দিয়া বাংলাভাষার নূতনভাবে দ্রুত পরিপুষ্টি সুরু হইয়াছে বিংশ শতকের প্রথম হইতে। বিশ্ব-সাহিত্যের রস-সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালীর ভাষা ও বিশিষ্ট কৃষ্টির যে নব রূপ আবর্তিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বিস্মিত—শ্রদ্ধামুগ্ধ না হইয়া পারিতেছে না। প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ আশুতোষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি-পরীক্ষায় মাতৃভাষা বাহনস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। বাংলায় দীর্ঘনিবন্ধ লিখিয়া প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করাও এখন দুঃসাধ্য নহে। কর্ম-ক্ষেত্র ও ভাবরাজ্যের পরিসর বৃদ্ধির সহিত ভাষার শব্দ-সম্পদ বাড়িতেছে, বানান, রচনা-রীতি, অলঙ্কার-প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে বহুমুখী সংস্কারের পন্থা নির্ধারিত হইতেছে, অজস্র অজস্র বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নিত্যনূতন জন্মলাভ করিতেছে।

সাহিত্যের এই নবজাগরণ-জনিত কোলাহলের মধ্যে ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমাকে এদেশে-বহুকাল-হইতে-অনাদৃত একটি জ্ঞান-বিভাগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে হয়; তাহা যৌন-বিজ্ঞান। কলা-হিসাবে যৌনতত্ত্বের আলোচনা ও অধ্যয়ন এককালে ভারতে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল বটে। কিন্তু নব্যবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে সকল ভৌতিক ও মানসিক তথ্য-তত্ত্বাদি পাশ্চাত্যদেশে প্রতিনিয়ত উদ্ঘাটিত হইতেছিল, তাহার খোঁজখবর আমরা বড়-একটা রাখিতাম না। তৎসম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিবার প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠা কোন দেশহিতৈষী আচার্যের মনে এযাবৎ জাগরিত হয় নাই। ক্বচিৎ কখনো একখানা সস্তার লোকপ্রিয় ইংরাজী পুস্তক, অথবা সংবাদপত্রে একটা অতিরঞ্জিত কাহিনী অথবা চুটকি প্রতিবেদন শিক্ষিত পাঠকের সাময়িক কৌতূহল চরিতার্থ করিত মাত্র।

ক্রমে ক্রমে উচ্চশিক্ষিত সমাজের এক অংশ পাশ্চাত্যদেশের যৌন-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাগুলির যথার্থ মূল্যাবধারণ করিতে শিথিল এবং Kraft-Ebing, Havelock Ellis, Ploss-Bartel, Jacobi, Marie Stopes, Norman Haire, Robinson, Iwan Bloch, Van de Velde, Westermerck, Stekel, Margaret Sanger প্রমুখ চিকিৎসক, সমাজ-সংস্কারক ও বৈজ্ঞানিকগণের অমূল্য পুস্তকগুলি সাগ্রহে পাঠ করিতে লাগিল। কিন্তু অধিকাংশ পাঠকই কঠিন ল্যাটিন্, জার্মান ও ইংরাজী পরিভাষা-কণ্টকিত, গম্ভীর বিচার-জাল ও বিদেশী উদাহরণ-সমন্বিত পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া আশানুরূপ পরিতৃপ্ত হইতে ও বিষয়গুলি আমূল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না। ইহার ফলে একদিকে যেমন সমুচিত শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয় নাই, অন্যদিকে তেমনি সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের দুষ্প্রাপ্যতা ও বহুমূল্যতা নিবন্ধন বহু উপযুক্ত ব্যক্তি সেগুলির অধিকাংশ পাঠ করিবার সুবিধা পান নাই।

তদুপরি, যে কারণেই হোক্, যৌন-বিষয়ক সুষ্ঠু জ্ঞানলাভের প্রতি জনসাধারণের এতকাল একটা অকারণ ঔদাসীন্য ছিল, অগভীর অবজ্ঞা ছিল, অপরাধমূলক সঙ্কোচ ছিল। যৌনজ্ঞানের প্রতি একটা ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা, আগ্রহ ও শ্রদ্ধা জাগাইবার জন্য সম্প্রতি যে সকল ব্যক্তি অগ্রণী হইয়া নিন্দিত বা অভিনন্দিত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম।

Havelock Ellis এর *Studies in the Psychology of Sex*, Ploss-Bartelএর *Woman* বা Westermerckeএর *History of the Human Marriage*এর ন্যায় পুস্তকের বাংলাভাষায় একান্ত অভাব দেখিয়া, মনে মনে লজ্জিত হইতাম; এবং নিজেকে এই অভাব-পূরণ-ব্রতের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত জানিয়াও দুরাশার বশবর্তী হইয়া, কয়েক বৎসর পূর্বে একটা সম্ভাবনীয় আধান-পদ্ধতির পরিকল্পনা করিয়াছিলাম। তদুপরি একখানি গবেষণামূলক প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার মানসে কিছুকাল যাবৎ বিভিন্ন ক্ষেত্র ও পাত্র হইতে কিছু-কিছু মালমশলা ও এদেশীয় ব্যক্তিগণের যৌন-জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে-ছিলাম।

অবশেষে বহু বন্ধু-বান্ধবী ও পাঠক-পাঠিকার দ্বারা সনির্বন্ধভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া এবং এদেশের কয়েকজন চিন্তাশীল জ্ঞানবীরের প্রভূত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া, আমাকে দ্বিধা-উদ্বেলিতচিত্তে "যৌন-বিশ্বকোষ" নামধেয় এই মহাকায় কোষগ্রন্থের সম্পাদন-ভার স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল। আয়ু অল্প, বিঘ্ন বহু, কার্য বিপুল শ্রম-ও-ব্যয়সাধ্য, বিদ্যাবুদ্ধি রীতিমতো সঙ্কীর্ণ। অথচ অগ্রসর হইলাম এই ভরসায়—যদি আমার অপটু হস্তের আলিম্পন-রেখার উপর অদূরভবিষ্যতে কোন সত্যকার তত্ত্বদর্শী তাঁহার মহত্তর ও পূর্ণতর প্রয়াসের আসন-পীঠ স্থাপন করেন।

বাংলাভাষায় এই বিদ্যার চর্চা নবাগত, এরূপ বৃহৎ আধারে উহাকে সংহত করার প্রচেষ্টাও অভিনব। সুতরাং পদে পদে ত্রুটি ঘটিবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য সদাশয় পাঠকবর্গের একদিকে ক্ষমাশীলতা ও অন্যদিকে সদুপদেশ আমার নিয়তকাম্য রহিল।

যৌনতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় যাঁহারা নিবন্ধ, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ও ব্যক্তিগত প্রভাব দিয়া আমাকে সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের দ্বাদশ জনকে লইয়া একটি উপদেষ্টা-সঙ্ঘ গঠিত হইল। ইঁহারা স্বদেশে ও বিদেশে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং যৌন মনস্তত্ত্ব, আইন বা চিকিৎসা-শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের ভরসায় আমি শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছি; যৌন-বিশ্বকোষকেও ইঁহাদের সহায়তায় আমি যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গ ও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিব বলিয়া আশা রাখি। প্রসঙ্গক্রমে এই দ্বাদশ উপদেষ্টা, বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও উৎসাহী পাঠকমণ্ডলীকে আমার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া রাখিতেছি।

নিজের অথবা অপরের যৌনজীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যাদি পাঠাইয়া, যে সকল পাঠকপাঠিকা সঙ্কলয়িতার গবেষণায় সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্য এই খণ্ডের ৯৬ পৃষ্ঠার পরে কতকগুলি প্রশ্ন মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইতেছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন মতো বিভিন্নস্থলে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর বা উহাদের অংশবিশেষ প্রেরকের নামধাম ব্যতিরেকে উদ্ধৃত করিয়া, পুস্তকের সম্পূর্ণতা-সাধনের চেষ্টা করা হইবে।

পাশ্চাত্য দেশে কলেজের ছাত্রছাত্রী হইতে উচ্চসম্মানার্হ বিচারক

ও অভিজাত-বধূ পর্যন্ত অকপটে নিজের যৌন-জীবনের কাহিনী ও তদ্বিষয়ক নিগূঢ় চিন্তাধারা ব্যক্ত করিয়া, বৈজ্ঞানিকের সত্য প্রতিষ্ঠায় সানন্দে সাহায্য করেন। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশে এরূপ শ্রেণীর উৎসাহী ব্যক্তি এখনো বিরল। কোন গোপনীয় চিঠিপত্র, সংবাদাদি আমি ছাড়া আর কেহ দেখিবার অধিকারী নহেন—এমন কি উপদেষ্টা-গণও নহেন। প্রয়োজন সাধনের পর সেগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হইবে।

অন্যূন আট হইতে অনধিক দশ খণ্ডে, আনুমানিক ছয় হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে ‘যৌন বিশ্বকোষ’ ৮।১০ বৎসরের মধ্যে শেষ করিবার বাসনা রহিল। কোষগ্রন্থের সনাতন রীতি অনুযায়ী বর্ণমালানুক্রমিকভাবে বিষয়গুলি বিন্যস্ত করার নানা অসুবিধা পরিদৃষ্ট হওয়ায়, উহার কল্পনা পরিত্যক্ত হইল। প্রতিখণ্ডের শেষভাগে একটি করিয়া বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট ও গ্রন্থসূচী সংযোজিত থাকিবে, এবং সমস্ত খণ্ড শেষ হইলে পৃথক একটি পুস্তিকায় ইংরাজী পরিভাষা-সমেত একটি বিস্তৃততর সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হইবে।

এই গ্রন্থমালা উচ্চশিক্ষিত নরনারীর মধ্যেই বিক্রীত হইবে; কারণ মাতৃভাষার মধ্য দিয়া বিশেষভাবে তাঁহাদেরই উচ্চতর জ্ঞানস্পৃহা, গবেষণা ও চিন্তার খোরাক্ যথাসাধ্য হৃদয়গ্রাহীভাবে সংগ্রহ করিয়া দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। জীবতত্ত্ব হইতে সুরু করিয়া মনস্তত্ত্ব, রোগ-নিদান ও ঔষধাবলী পর্যন্ত একে একে যৌনতত্ত্ব সংপৃক্ত সকল কথাই প্রচুর দৃষ্টান্ত সহ ইহাতে বর্ণিত হইতে থাকিবে। প্রথম হইতেই মূল যৌনতত্ত্বের আলোচনা অথবা আপন-আপন রুচি অনুযায়ী বিষয়বিন্যাস প্রত্যাশা করা পাঠকগণের পক্ষে সমীচীন হইবে না। আমাদের এই বিরাট উদ্যমের সাফল্য ও ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাঁহাদের ধৈর্য, দাক্ষিণ্য ও সহযোগিতার উপর। ইতি।

১লা আষাঢ়, ১৩৪৫ সাল
৯নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

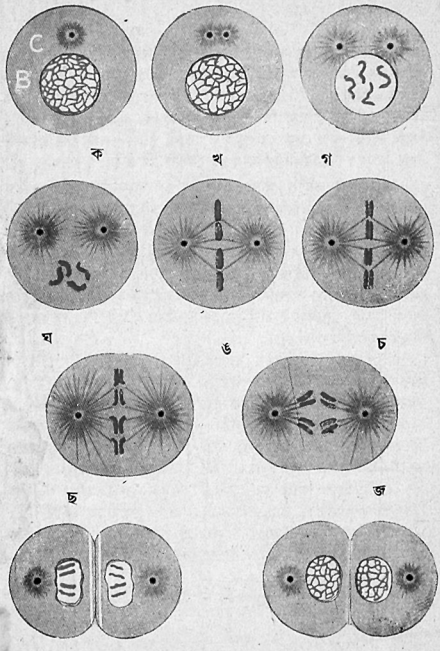

কোষাণুর স্ববিচ্ছেদন-ক্রিয়া

(৭৭ পৃষ্ঠা)

যৌন বিশ্বকোষ

প্রথম খণ্ড

অবতরণিকা

মানুষের সর্ব কর্ম, সর্ব চিন্তা, সর্ব আকাঙ্ক্ষা, সর্ব আয়োজন, সর্ব বেদনা, সর্ব পুলকের মূলে নিবদ্ধ রহিয়াছে তাহার দুই প্রকারের জন্ম-জন্মার্জিত ক্ষুধা। একটি ক্ষুধা আহারের, অন্যটি প্রেমের। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ অন্ন-সংস্থানের কত উপায়—কত ফিকির-ফন্দিই না উদ্ভাবন করিয়াছে! বাল্যকাল হইতে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার ঔদরিক ক্ষুধা মিটাইবার শত সহস্র পন্থার সহিত ধীরে ধীরে পরিচিত হইতে থাকে। মুখ্যত অর্থোপার্জনের জন্যই সে জ্ঞানার্জন করে, এবং উপার্জিত অর্থের একটা বড় অংশ তাহার ক্ষুন্নিবারণের জন্যই ব্যয়িত হয়। তারপর, আহার্য নির্বাচন, গ্রহণ ও পরিপাক করিবার রীতি-নীতি সে সযত্নে শিখে। বিজ্ঞান তাহাকে বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সজাগ করে। কোন্ খাদ্যে তাহার স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি, কিসে তাহার জীবন বিপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে সুপরিস্ফুট ধারণা লইয়া সে সংসার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়।

প্রেমক্ষুধা সম্বন্ধে শিক্ষার অভাব

কিন্তু অন্য যে ক্ষুধার বীজটি সৃষ্টিকর্তা জন্মদিন হইতে তাহার সত্তা-মৃত্তিকায় প্রোথিত রাখিয়া ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত করিতে থাকেন, যে ক্ষুধার অপ্রতিহার্য তাড়নায় সে যৌবন-সমাগমে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া সহস্র বিপদকে আমন্ত্রণ করে, সেই প্রেমের ক্ষুধা সম্বন্ধে কোন সুযন্ত্রিত শিক্ষাই মানুষ পায় না। সমাজ ও পরিবার প্রেম জিনিষটাকে তাহার নিকট যথাসাধ্য অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত ও অপাংক্তেয় রাখিবার চেষ্টা করে। যাহার বিদ্যমানতা ও আত্মস্ফুরণের আবেগ বর্ধিষ্ণু মানবক অন্তরে অন্তরে দিবসরাত্র অনুভব করে, তাহার স্বরূপ জানিবার—তাহাকে সুপরিচালিত করিবার স্পৃহা জাগা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যৌনক্ষুধা সম্বন্ধে কোন কল্যাণকর জ্ঞানলাভের প্রণালী সভ্যতাভিমানী সমাজের তরুণ-তরুণী খুঁজিয়া পায় না।

যৌনক্ষুধা প্রীণনের জন্য তাহারা আপন আপন সহজবুদ্ধির প্রেরণাকেই শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক-রূপে গ্রহণ করে। প্রেম সম্বন্ধে কিছু জানিবার ও বুঝিবার দুর্নিবার কৌতূহল তাহারা অকালপক্ক বন্ধু-বান্ধবী ও দুরভিসন্ধিপরায়ণ দাসদাসীর নিকট হইতেই মিটাইয়া লইতে থাকে। অথচ অনাদিকাল হইতে প্রেমের পূজা, স্তবস্তুতির বিরাম নাই; প্রেমকে রাজ-সিংহাসনের বহু ঊর্ধ্বে বসাইবার প্রবৃত্তি কত কবি, কত দার্শনিকের মনেই না উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যে, সাহিত্যে, চারু শিল্পে, ললিত কলায়, নৃত্যগীতে, ভাস্কর্যে, বিপ্লবে, অনুশাসনে, দিগ্বিজয়ে ও মানুষের অতিপ্রাকৃত অভ্যুত্থানের অন্তরালে জাগিয়া রহিয়াছে প্রেমের অমোঘ প্রভাব—যৌনক্ষুধার অমর ইঙ্গিত।

জাতি ও সমাজের উত্থান-পতনের পরতে পরতে 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর' তরলিত সুবর্ণ রেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে; কোনো অতিনৈষ্টিক ঐতিহাসিকের সাধ্য নাই তাহা মুছিয়া ফেলিবার। প্রেমের বন্ধনই রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে তাহাদের নিজ নিজ কক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়া, নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে পরিভ্রমণ করাইতেছে। প্রেম—আসমুদ্র-করগ্রাহী রাজাধিরাজ, যাহার পদপ্রান্তে বিশ্ববিজয়ীও তাঁহার মণিমুকুট নামাইয়া রাখেন। তাই লাতিন কবি ভার্জিল প্রেমকে '*Omnia vincit amori*' (সর্বজয়ী) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; ইহুদীরাজ সলোমন গাহিয়াছেন —'প্রেম শক্তিমান মৃত্যুর সমান'; বৈষ্ণব কবি সুর তুলিয়াছেন—

পিরীতি মুরতি পিরীতি রতন
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক জনমে জনমে
যজ্ঞ করিয়াছিল।
সই! পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা।...

আদিম মানবের যৌনবিষয়ক কল্পনা

প্রাগৈতিহাসিক যুগে গুহাবাসী মানুষ যৌন সম্মিলনকে নিজের প্রজ্ঞা-হীন প্রেরণার বশে অনেকাংশে চালিত করিলেও, উহাকে ঘৃণ্য, কলুষিত ও অশালীন বলিয়া কখনও জ্ঞান করে নাই। বরং উহাকে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান ও মহিমাময় ঐশ্বর্য-রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। ভগবানকে

তাহারা ইন্দ্রিয়ানুভূতির আওতায় পাইত না, অথচ তাঁহার একটা সহজ-গ্রাহ্য প্রতীক নির্মাণ করিয়া, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময়ী গিরি-নদী-বন-প্রান্তরভূষিতা ধরিত্রী সৃষ্টির জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল।

মানুষ যেমন তাহার যৌনযন্ত্র সহায়তায় জীব সৃষ্টি করে, আদিম মানব কল্পনা করিয়া লইয়াছিল যে, পরমেশ্বরও বুঝি ঠিক তেমনি করিয়া এই বিশ্ব ও ইহার যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমকে সৃজন করিয়াছেন। তাই তাহারা নিজেদের সহজ সরল বুদ্ধির সাহায্যে বিরাট্ বৃক্ষ-প্রস্তরাদি কুঁদিয়া লিঙ্গ ও যোনি-মূর্তি গঠন করিয়া, তৎসকাশে পূজা-নিবেদন করিত, জীবজন্তু বলি দিয়া বিশ্বেশ্বরের করুণা ভিক্ষা করিত—প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের রোষবহ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাহিত। যৌনেন্দ্রিয়ের পূজা হইতে পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন ধর্ম-পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে। এখনও হিন্দু, খৃষ্টীয়, পারসীক্, ইহুদী প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে উহার গরিমাময় পদচিহ্ন জাগিয়া রহিয়াছে। এখনও হিন্দু স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে গৌরীপট্ট-সমন্বিত শিবলিঙ্গ ও কামাখ্যার দেবীযোনি পরম-ভক্তিভরে পূজা করিয়া থাকে।

পুরাযুগে যৌন যথেচ্ছাচার

পুরাযুগে চ্যাল্‌ডীয়, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, গ্রীক্, রোমীয়, আস্থরীয় (Assyrians), সেল্ট্, টিউটন্, স্যাক্সন্, ব্রিটন্, স্কাণ্ডেনেভীয়গণ বৈদগ্ধ্যের খুব নিম্নস্তরে না থাকিয়াও লিঙ্গপূজাকে জাতীয় জীবনে উচ্চাসন দান করিতে কার্পণ্য করে নাই। এ সম্বন্ধে আমরা পৃথক একটি খণ্ডে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। প্রাচীন হিন্দু ঋষিগণ ইন্দ্র-অগ্নি-মিত্রাবরুণের সঙ্গে সঙ্গে মদন-রতি-উর্বশীর সমুদ্ভব অসঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই, এবং দেবতারাও যে মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতার অতীত নহে—তাহা রূপকের মধ্য দিয়া কল্পনা করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। গ্রীসের বেক্কাস ও রোমের স্যাটার্ন্ নামক আনন্দ-দেবতার উৎসবে সর্ব বয়সের ও সর্ব সামাজিক স্তরের নরনারী কি ভাবে যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিত, কি ভাবে মাইলিত্তা, অ্যানাইটিস্ ও অ্যাফ্রোদিতা দেবীর পূজা-মন্দিরের মুক্তাঙ্গনে অবাধ প্রেমের ফেনিল প্রবাহ ছুটিয়া চলিত, তাহার আমূল পরিচয় পাঠকগণ যথাস্থানে পাইবেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে দুই-চারি কথার মাত্র উল্লেখ করিয়া যাইব।

হিরোডোটস্-লিখিত খৃষ্টপূর্ব যুগের সুবিখ্যাত ইতিবৃত্ত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ব্যাবিলন্‌বাসিনী কুমারীগণ রতিদেবীর মন্দিরে আসিয়া যতদিন না কোন ভক্তের নিকট অন্তত বারেকের জন্য নিজেদের দেহ দান করিয়া যাইত, ততদিন তাহারা বিবাহের উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইত না। আইরিস্ দেবীর পূজা উপলক্ষে মিসরে সেকালে নরনারীর অবাধ সংলাপ, হাস্য-বিদ্রূপ ও যৌন-সম্মিলনের প্রথা নিষ্কলুষ প্রবৃত্তিরই পরিচয় বহন করিত। প্রকাশ্যে উলঙ্গ হওয়া বা পূজা-পার্বণে দেহের সর্বাঙ্গ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া, সেকালে দোষাবহ ছিল না; এমন কি, অন্য কর্তৃক তথাকথিত গোপনাঙ্গে হস্তার্পণ করাও নিন্দার্হ ছিল না।

মূশা আগমনের পূর্বে এসিয়া মাইনর ও প্যালেস্টাইনে স্ত্রী-পুরুষের স্বচ্ছন্দ বিচরণ একটা সহজসাধ্য পুণ্যাচরণের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছিল। লিঙ্গ ও যোনিকে উত্তর যুগের যীহোবা-বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ দেহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিত, কারণ তাহাদের বিশ্বাস ছিল—

জগতের নিবিড়তম আনন্দানুভূতি লাভের ও বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখার রহস্যাচ্ছন্ন উৎসমূল ওই স্থানেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। 'ওল্ড্ টেস্‌টেমেণ্টে'র বহুস্থানে ইন্দ্রিয়-প্রশস্তির ইঙ্গিত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে দেখা যায়। তখনকার যুগে ঈশ্বরের নামে শপথ করিবার প্রয়োজন হইত না; আপনার বা অপরের যৌনেন্দ্রিয়ে হাত রাখিয়া দিব্য করিলেই বক্তার সত্যকথন সম্বন্ধে সংশয়ের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিত না। আব্রাহাম্ একবার তাঁহার ভৃত্যকে তাঁহার লিঙ্গ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

লিঙ্গচ্ছেদ

যৌনেন্দ্রিয় মানুষের পক্ষে যেমন মূল্যবান, তেমনি পবিত্র বলিয়া প্রতীত হইত বলিয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও নিহত শত্রুর লিঙ্গ কাটিয়া ফেলিবার একটা রীতি সেকালে মধ্য-এসিয়ায় যোদ্ধাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বীর ডেভিড্ রণ-নিপাতিত ফিলিস্টাইন্‌দের দেহ হইতে সঞ্চকর্তিত দুই শত লিঙ্গ শ্বশুর-গৃহে সদর্পে উপহার দিয়া, সল্-এর সুশ্রী দুহিতাকে ক্রয় করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগেও তুর্ক, কুর্দ্, বুল্‌গার, কিরঘিজ্, আফ্রিদি, মাশুদ্ ও মোহ্‌মন্দ প্রভৃতি জাতির অর্ধবর্বর, অশিক্ষিত সৈন্যদের মধ্যে অরাতির লিঙ্গচ্ছেদ অথবা লিঙ্গ-সংগ্রহ করিবার একটা হারীতিক কুসংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো কোনো নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন,—ইহুদী ও মুসলমান ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্যকালে লিঙ্গের অগ্রচ্ছদা কাটিয়া দিবার যে প্রথা আছে, তাহাতে সুদূর পুরাকালে লিঙ্গপূজার একটা যুক্তিসহ প্রমাণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

যোনিপূজার ব্যাপকতা

কোনো কোনো দেশে লিঙ্গ অপেক্ষা যোনির পূজা অধিকতর শ্রদ্ধা ও সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। যোনিকে আমাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষগণ জীবনের গূঢ়তম রহস্যাধার—জীবাঙ্কুরের বিকাশ ও পুষ্টির অসীম শক্তিগর্ভ অঙ্গ-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। শস্যশ্যামলিম ধরিত্রীকে সর্বজাতীয় পুরাণে স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রম্যন্তে তত্র দেবতাঃ'—এ বিশ্বাস আর্য ও অনার্যগণ উপনিষদ-স্মৃতি রচনার বহুপূর্বেই হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাই সেকালে মাতৃকতন্ত্র সমাজ যেমন একদিকে উদ্ভবলাভ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি নারীকে দেবীরূপে শ্লাঘনীয় মর্যাদায় ভূষিত করা হইয়াছিল। স্ত্রীলোক আদ্যা-শক্তি, মহামায়ার অংশীভূতা বলিয়া স্ত্রীত্বের প্রতীক স্বরূপ যোনি-পূজার তখন এত সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

বাইবেলে আশীরী নামক এক পূত কাষ্ঠ-পিণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। আশীরী প্রাক্‌খৃষ্টীয় যুগে ফিনিসীয়দের প্রধান দেবতা বাআ্যাল্-পত্নী অ্যাশ্‌টোরেথ্-এর জননেন্দ্রিয়ের চিহ্ন মাত্র। প্রকাণ্ড একটি কাঠের গুঁড়ি ডিম্বাকারে চাঁচিয়া-ছুলিয়া উহার মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ ছিদ্র কুঁদিয়া দেওয়া হইত। এই ছিদ্রপথের উপরে একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-কীলক প্রবর্ধিত থাকিত, উহা ছিল ভগাঙ্কুরের (Clitoris) প্রতিরূপ।

তৎকালীন্ ক্রিশ্চিয়ান্ ধর্ম-মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের শীর্ষদেশে একটি উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তি খোদাই করা বা অঙ্কিত থাকিত। তারপর ভিতরের

খিলান-গাত্রে বা কুলুঙ্গির মধ্যেও নানারূপ নগ্ন বা লালসা-ভঙ্গিমাময় নারীমূর্তি দেখা যাইত। কোনো কোনো দেশে দরজার মাথায় কাঠ-কয়লা দিয়া সুস্পষ্টভাবে এক বা একাধিক যোনি আঁকিয়া রাখা হইত—দুর্ভাগ্য ও অপদেবতাকে দূরে রাখিবার জন্য। তারপর ঐ যোনিচিহ্ন কালক্রমে ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া অশ্বক্ষুরে পরিণত হয়। এখনো পর্যন্ত অশ্বক্ষুরের অন্তর্নিহিত সৌভাগ্যদানের শক্তিতে সমগ্র খৃষ্টীয় জগৎ বিশ্বাস পোষণ করে। ক্রুশ ও স্বস্তিক-চিহ্নেও যে প্রাচীন যুগের বহু-সংস্তুত যৌন-সম্মিলনের আভাষ লাগিয়া রহিয়াছে, তাহা নৃতত্ত্ববিশারদগণ অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন।

যৌনাবেগ ও ধর্মভাব

যৌনাবেগের স্ফূরণের সহিত ধর্মাচরণে আন্তরিকতার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল; এখনও আছে। মনোবিশ্লেষকগণ বলিতেছেন যে, সভ্যতার তাগিদে জোর-করিয়া-অভ্যাস-করা শালীনতা ও ব্রহ্মচর্যের মধ্যে কল্পনাতীত কল্যাণের অতিরঞ্জিত আকর্ষণ—ধর্মাচারীর যৌনভাবের প্রাচুর্যকে বাহত দমাইয়া রাখিলেও উহার সমূল বিনাশ-সাধন করিতে পারে না। পরন্তু তাঁহারা বহু পর্যবেক্ষণের ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, স্বভাবত যাহারা অত্যন্ত যৌনাবেগপ্রবণ বা কামকলাকুশলী হয়, তাহারা প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্যের সূচনায় সহজেই গোঁড়া ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তদ্ব্যতীত ধর্মাবেগ একই লোকের মধ্যে একই সময়ে সামান্য অছিলা পাইয়া যৌনাবেগে পরিণত হইতে পারে। এ তথ্য প্রাচীনদের কাছে সুপরিস্ফুট ছিল বলিয়াই পূজা-মন্দিরের পাশে পাশে তাহারা রূপ-পশারিণীদের মেলা বসাইয়া দিয়াছিল।

দেব-সেবিকার উদ্ভব

তারপর মন্দিরের মধ্যেও ধর্মকার্যে আজীবন আত্মোৎসর্গকারিণী এমন কতকগুলি চিরকুমারী প্রতিপালিত হইত, যাহারা ভক্তের লালসাপূর্ণ দৃষ্টির নিকট নমনীয়া ছিল। যে-কোন দেবদর্শনার্থী পূজা-নিবেদনের পরে তাহার পছন্দমতো দেব-সেবিকাকে একটা নির্দিষ্ট মূল্যদানে কায়িকভাবে উপভোগ করিতে পারিত; এবং এরূপ করা পুণ্যকার্যেরই অঙ্গস্বরূপ গণ্য হইত। সম্ভবত পুরোহিতদের ব্যবসা-বুদ্ধি দেবদাসী-প্রথা সৃষ্টির মূলে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে। শুধু দেবতার প্রণামীতে মন্দিরের পূজা ও পূজারীদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার ব্যয়নির্বাহ হইত না; সেইজন্য ঐ দেবসেবা-ব্রতিনীদের দেহ-বিক্রয়-লব্ধ অর্থের একটা মোটা অংশ মন্দিরের তহবিলে জমা পড়িত। সে অর্থ ভক্তের প্রণামীর চেয়ে কোন অংশে অগৌরবের ছিল না এবং যাহারা ঐ অর্থ উপার্জন করিত, তাহারা পুরোহিত অপেক্ষা কম সম্মানার্হ ছিল না। খৃষ্টপূর্ব যুগে দেশ-ভেদে মন্দিরবিলাসিনীদের নাম ছিল 'হাক্‌ডেশোঃ' বা 'কাদিষ্টু' (অর্থাৎ পুণ্যাত্মা)। ঐ বরাঙ্গানারাই আজ কাল-নেমির আবর্তনে বারাঙ্গনায় পরিণত হইয়াছে।

হাক্‌ডেশোরাই তখনকার নারী-সমাজে আদর্শচরিত্রা হইয়া উঠিয়াছিল। অ্যামস্ (ii, 7) একস্থলে অভিযোগ করিতেছেন যে, ভদ্র বংশীয়া হিব্রু কুমারীগণও মন্দিরে গিয়া দেবদাসীদের দেখাদেখি পূজাবেদীর পাশে দাঁড়াইয়া ক্ষণিকের প্রেমিকদল-দ্বারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হইত। হোসিয়া (iv, 14) সাধারণ গণিকা ও দেবদাসীদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে গিয়া, শেষোক্তদের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি করিয়াছেন। কে না জানে—

দক্ষিণ ভারতে দেবদাসী প্রথা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে; তাহার উচ্ছেদ-সাধনের সময় দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণও কী তুমুল প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছিলেন!

মুশা ও ঈশার নৈতিক নিগড়

শত শত বৎসর ব্যাপী ধর্মের নামে যথেচ্ছ যৌন-ব্যবহারে জাতির মেরুদণ্ড যখন দুর্বল হইয়া পড়িল, তখন ইহুদীদের দেশে ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ হিসাবে ক্রমান্বয়ে মুশা ও ঈশা আসিয়া যে বাণী প্রচার করিলেন, তাহা যে সর্ববিধ যৌন-আচরণের নিন্দায় অভিসিঞ্চিত হইবে—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! সর্ববিধ ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। ধর্মের মধ্য হইতে তাঁহারা যৌন আবেগের দ্যোতনা একেবারে বাদ দিতে চাহিলেন; কাম-দমন, ব্রহ্মচর্যপালন ও নিখিল-নারীর প্রতি করুণামিশ্রিত অবিশ্বাস—এই ত্রিপাদ দিয়া তাঁহারা নূতন ধর্মের নাট্‌মঞ্চ প্রস্তুত করিলেন। কয়েক শত বৎসর ধরিয়া খৃষ্টধর্ম যৌনভাবলেশহীন সাধন-কৃচ্ছ্রতা ও নৈতিক পবিত্রতার বীজমন্ত্র দিকে দিকে ছড়াইয়া, যেমন বহু ভক্তকে গৃহছাড়া—বহু সতীকে স্বামীহারা—বহু ভ্রষ্টাকে স্বর্গরাজ্য-বিভোরা করিয়া ছাড়িল, তেমনি কঠোর সাধননিষ্ঠার পাষাণ-নিম্নে একটু একটু করিয়া ব্যথিত যৌনক্ষুধার সর্বনাশী বিস্ফোরক সঞ্চয় করিতে লাগিল।

সর্বপ্রকার যৌন ব্যবহারের বিরুদ্ধে ধ্বজপট উড়াইয়া, খৃষ্টধর্ম কুমারী মেরীর নিরঞ্জন গর্ভধারণের (Immaculate conception) আদর্শ দিকে দিকে প্রচার করিতে লাগিল। কিন্তু কোন কুমারীই যে

যৌন সংযোগ ব্যতিরেকে স্বয়ং ভগবানকেও গর্ভে ধারণ করিতে পারেন না—এ কথা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মূঢ় বিশ্বাসের যুগে প্রচার করা যত সহজ-সাধ্য হইয়াছিল, এই যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের যুগে ততটা সহজসাধ্য নহে। এখন আমরা নিশ্চিন্তভাবে বিশ্বাস করিতে পারি যে, সূত্রধর জোসেফের ঔরসে কুমারী মেরীর গর্ভে তথাকথিত 'ঈশ্বরপুত্র' খৃষ্টের জন্ম হইয়াছিল—ঠিক যেমন করিয়া সূর্যবংশীয় কোন বীর্যবান পুরুষ (আকাশের দেবাখ্যাধারী সূর্য নহে) কুমারী কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম দিয়াছিলেন।

যে যৌন ব্যভিচার শত শত বৎসর ধরিয়া আপামর-সাধারণের মধ্যে অপাপবিদ্ধতার আব্‌হাওয়ায় পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহাকে অপবিত্র বলিয়া উৎসাদন করা বড় সহজসাধ্য ছিল না। অথচ মহাত্মা যীশু-খৃষ্ট নিজের রক্তের মধ্যেই যুগ-যুগব্যাপী আচরিত দুর্নীতির আভাষ পাইয়া মরমে মরিয়া গেলেন, এবং এই পাপ অবিলম্বে বিদূরিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রতীয়মান কারণেই পাপীকে ঘৃণা করিবার তাঁহার উপায় ছিল না; তিনি পুংশ্চলী মেরী ম্যাগ্‌ডেলেনের হাতে গভীর পরিতৃপ্তির সহিত তৃষ্ণার বারি পান করিয়াছিলেন। যীশুর দৈহিক পবিত্রতা ও নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্যের মহান্ আদর্শ তাঁহার অন্তরঙ্গ ও পরবর্তী শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে একটা দিব্য অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু অগণিত ভক্তগণ জনে-জনে কি সে আদর্শ নিজেদের জীবন-যাত্রায় পূরাপূরি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল? তাহারা কি সকলে আল্‌খাল্লা পরিয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিল? এবং সংসার ছাড়িয়াই কি তাহারা মদন-পীড়নের হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছিল?

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো

সাধু পল করিন্থ্ বাসীদের লিখিলেন, "it is good for a man not to touch a woman" (Cap. vii). জুস্টিনস্ উপদেশ দিলেন যে, যৌন-সম্মিলন জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয়ও নহে, অপরিহার্যও নহে, বীর্য-ধারণ করাই শ্রেষ্ঠ মহত্ব। হীরোনিমস্ টীপ্পনি করিলেন যে, ঈশ্বর ও তাঁহার ভজন-মন্দিরের প্রত্যাদেশ—একক জীবন যাপন করা; তাহাতে নিতান্ত অশক্ত হইলে, একটিমাত্র বিবাহ করিয়া সংযত-ভাবে চলা। চক্ষের সম্মুখে পূতচরিত্রতার চিত্র উপস্থাপন ও কর্ণের নিকট অশ্রান্ত-চিত্তশুদ্ধির গুঞ্জন,—ইহার ফলে মাত্রাহীন ব্যভিচার ও জাতির নৈতিক অধঃপতনের উদ্দাম স্রোতে কিছুদিনের জন্য যৎসামান্য ভাঁটা পড়িল বটে, কিন্তু 'কোটিকে গোটিক' ভক্তমাত্র কোনক্রমে দেবত্বের দূরারোহ স্তরে উপনীত হইতে পারিল; বাকি সকলে ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করিয়াও ষড়রিপুর যেমন দাস ছিল, তেমনি রহিয়া গেল। ওদিকে কত শত লোক নিজের সহজ প্রবৃত্তিকে টুঁটি টিপিয়া মারিতে গিয়া নিজেরা তিলে তিলে দগ্ধিয়া মরিল; কত শত লোক বিজনে ব্রহ্মচর্য সাধন করিতে বসিয়া ক্ষণিক দৌর্বলের বশে অপ্রত্যাশিত পাপের পঙ্কিল পল্বলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কত মঠ—কত মন্দির—কত শিক্ষাপীঠ গোপন লালসাগ্নি-শিখায় মসীলিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ মধ্যযুগের ইতিহাসে ও বহু নরনারীর আত্ম-জীবনের পাতক-প্রকাশে (confessions) লিপিবদ্ধ আছে।

আশ্রমে ও বিহারে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে নানারূপ গুপ্ত কদভ্যাস, বিযোনিকাম, গোপন অভিসারের নিত্যলীলা যেভাবে

বিসর্পিত হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে মুষ্টিমেয় সত্যনিষ্ঠ ধর্মগুরুর দল ঘৃণায়, লজ্জায়, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন।...শয়তান, তাহার অগণ্য অনুচর ও সূক্ষ্মদেহী প্রেতাত্মাদল চৈত্য-বিহারের গাত্রে সংগোপনে কল্পনাতীতভাবে অশ্লীল চিত্র আঁকিয়া যায়; তরুণ ধর্মসাধকের উপাধান-নিম্নে প্রেমপত্র রাখিয়া যায়; স্বপ্নঘোরে তাহাদের সযত্নরক্ষিত শুক্র অজ্ঞাত কৌশলে নিষ্কাশিত করিয়া কটিবাসে তাহার কলঙ্ক-চিহ্ন আঁকিয়া রাখে। সংঘারামের ভিক্ষুণীগণ অদৃশ্য পিশাচ কর্তৃক ঘুমঘোরে ধর্ষিতা হইতে ও গর্ভ ধারণ করিতেও লাগিল। কোন মন্ত্র-কবচেই ওই দুষ্ট লালসালোলুপ নিবাত-কবচের নিপাত করা গেল না!...নিজেদের দুষ্প্রবৃত্তিমূলক কার্য ঢাকিবার জন্য তাহাদিগকে কত কল্পনারঙীন্ গল্পেরই না সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। চিরনিরয়-গমনের ভয় ও কঠোরতর প্রায়শ্চিত্তবিধির প্রবর্তন করিয়াও ধর্মসংস্কারকগণ তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীর প্রাণে পুষ্পধন্বার প্রভাব বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। বৌদ্ধ ভারতীয় যুগেও আমরা ঠিক এই অবস্থাই দেখিতে পাই। সর্বদেশের সর্বকালের ইতিবৃত্ত ঘাঁটিয়া দেখা যায়—ধর্মের কঠোরতা যত বাড়ে, অধর্মের গোপনতা তত বাড়িয়া চলে।

সাধু অগস্টিনস্ তাঁহার পাতকপ্রকাশ-প্রসঙ্গে একস্থানে স্বীকার করিয়াছেন, " my heart was burning, boiling and foaming with unchastity; it was poured out, it overflowed, it went up in licentiousness." তাঁহার ন্যায় বহু সংসারত্যাগী ভক্তিমার্গচারী সাধক কঠিন আত্মসংযমের বিধিমতো চেষ্টা করিয়া একদিন বিদ্রোহী ইন্দ্রিয়ের নিকট আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন। ভক্ত অরিজিনিস্ স্বতোৎসারিত কাম-প্রবৃত্তিকে কোনমতে প্রদমিত

করিতে না পারিয়া, স্বহস্তে নিজের যৌনেন্দ্রিয় ছেদন করিয়াছিলেন।

স্বামীরূপে ভগবান বা গুরুর অনুধ্যান

মারী দ্য লিন্‌কারনেশিঅঁ নাম্নী এক হরি-প্রেমোন্মাদিনী নারী যোগাসনে বসিয়া মাঝে মাঝে এক প্রহেলিকাময় পুরুষ কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইত। এই দিব্য স্বরের অধিকারী ছিলেন নাকি স্বয়ং যীশুর আত্মা; তিনি ভক্তিমতীকে আশ্বাস দিতেন যে, তিনি অচিরে তাহাকে পতিরূপে দর্শন দিবেন। মারী প্রতিনিয়ত যীশুকে স্বামীরূপে ভজনা করিত, ভক্তিগদগদ কণ্ঠে তাঁহার উদ্দেশে প্রার্থনা জানাইত—"হে আমার প্রভু, আমার প্রেমিক! কবে আমি তোমায় প্রাণ ভ'রে আলিঙ্গন করতে পাব? যে দুঃসহ যন্ত্রণায় আমি দিবানিশি জ্বল্‌ছি, তা' দেখে তোমার কি একটু দয়া হয় না? হে আমার প্রিয়তম, হে আমার চির সুন্দর, জীবন-দেবতা! আমার দুঃসহ বেদনা লাঘব করা দূরে থাক, তুমি আমার দুঃখে আনন্দানুভব কর। ওগো, তুমি এস, আর দেরি ক'রো না, আমায় আলিঙ্গন দাও—তোমার পুণ্যময় বাহুবন্ধনে আমায় সুখে মরতে দাও।"...

এমনি করিয়া মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিয়া যায়। সেই দূরাগত অস্পষ্ট স্বর ক্রমশ নিকটতর, স্পষ্টতর হইল। একদিন ভাব-সমাহিত অবস্থায় মারী শুনিতে পাইল, "তোমার সাধনার অবসান হয়েছে, প্রেমময়ি! আমি স্বামীরূপে তোমার মধ্যে এসেছি। তুমি স্বপ্নঘোরে আমাকে উপভোগ ক'রে দিব্য সুখলাভ করবে।"...

চিরকুমারী, বালবিধবা অথবা বিবাহ-জীবনে বীতস্পৃহ নারীরা ঈশ্বর-

ভজনার মধ্য দিয়া যৌন-এষণার ছদ্মবেশী আবেগ উপলব্ধি করিয়াছে এবং ঈশ্বর বা তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষকে রক্তমাংসময় আদর্শ প্রেমিক রূপে নিদিধ্যাসন করিয়া, মানস-লোকে যৌনোপভোগের অনুরূপ তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। অনেকে নিশীথ বা জাগ্রৎ স্বপ্নেও মানবরূপী ঈশ্বরের সহিত নিজেকে রমণ-নিমগ্ন দেখিয়া স্তম্ভিত ও পুলকিত হইয়া গিয়াছে। এদেশে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম-সাধক ও সাধিকার মধ্যেও এই রূপ দৃষ্টান্তের অপ্রতুলতা নাই।

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধু মার্ক্‌কে সিংহ-মূর্তিরূপে অর্চনা করা হয়। মধ্যযুগে সেণ্ট্‌ ভেরোনিকা নাম্নী এক তাপসী ওই দিব্য সিংহমূর্তি দেখিয়া এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়ে যে, যীশুকে ভুলিয়া সেণ্ট্‌ মার্ক্‌কেই তাহার একমাত্র অভীষ্ট দেবতা-রূপে বরণ করিয়া লয়। সিংহ-মূর্তি দিবারাত্র তাহার কল্পনালোকে বিচরণ করিতে থাকে। অবশেষে সে একটি সিংহ-শিশু যোগাড় করিয়া সযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিল। তাহাকে সে প্রত্যহ শয্যায় লইয়া শয়ন করিত, যখন-তখন আলিঙ্গন ও চুম্বন করিত এবং নিভৃতে বিভোর হইয়া ঐ কেশরী-শাবককে স্তনবৃন্ত চোষণ করাইত।

হিন্দু-সমাজেও নিজেকে বৃন্দা বা রাধারূপে কল্পনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করা ও তাঁহাকে ভাবাবেশে প্রেমিকরূপে প্রাপ্ত হওয়ার ভূরি ভূরি উদাহরণ আমরা পাইয়াছি। দেখিবেন, বয়স্থা কুমারী বা ব্রহ্মচারিণী বালবিধবা শিলাময় বা ধাতুময় রাধামাধব-বিগ্রহকে স্বহস্তে স্নান করাইয়া বেশবিন্যাস করে, যথাসময়ে ভোগ-নিবেদন করে, ক্ষুদ্র পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেনিভ শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া ব্যজন করে—গাত্রে মাছিটি পর্য্যন্ত বসিতে দেয় না, সন্ধ্যায় শীতল

দেয়, রাত্রে আরতি করে। পরিশেষে তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া মশারী টানাইয়া দেয় এবং ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নিজে সেই পালঙ্কের পার্শ্বে ভূমিতলে অঞ্চল বিছাইয়া পরম তৃপ্তিভরে নিদ্রাগত হয়। নিদ্রা-ঘোরে সে দেবতার সহিত সঙ্গম-সুখে মাতিয়া উঠে এবং নিদ্রাভঙ্গে সেই পুলক-স্মৃতিতে শিহরিয়া শিহরিয়া নিজেকে লোকাতীত সুখের অধিকারিণী করিয়া তুলে। কায়ে ও বাক্যে যৌন-প্রভাব হইতে সে হয়তো নিজেকে প্রায়-মুক্ত রাখে, কিন্তু মনে সে কি একেবারে নিষ্কলুষ থাকিতে পারে? নির্জীব দেবতার প্রতি তাহার একান্তসমর্পিত প্রেম-কুসুমে কি দৈহিক আত্মপ্রসাদনের কীট মুখ লুকাইয়া নাই?

শিশ্নদেবতা ও বৃষধ্বজ

সর্ব-সাধনার কেন্দ্রীভূত—সর্বদেবতার আদিভূত যে শিশ্নদেবতা, তাহার সন্ধান আমরা ঋগ্বেদের মধ্যে (৫ ঋক্, ২১ সূক্ত, ৭ মণ্ডলে) পাই। রুদ্র বা শিব ছিলেন তখনকার কালে রাত্রি ও ঝঞ্ঝার অধিদেবতা। তাঁহারই কৃপায় লোকে রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া নিজের যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করিত (—এখনও করে), পানোৎসবের মত্ততায় আত্মহারা নরনারী উচ্ছৃঙ্খলতার দুরন্ত পাথারে নির্ভয়ে ডুব দিত। লোকের মনে সুরত-স্পৃহা জাগাইয়া জীব-সৃষ্টির সূত্রপাত করেন—এই দেবদেব রুদ্র। সুতরাং তিনি নিখিলজগতের মঙ্গল-বিধাতা—শিব; তাঁহার শিশ্ন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ—সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। সেইজন্য বাস্তব-জগতে তাঁহার শিশ্নের তুলনা করা হইল বৃষ-লিঙ্গের সহিত। তাই তাঁহার আর এক নাম হইয়াছিল 'বৃষধ্বজ'। পরিশেষে বৃষকে তাঁহার বাহন-রূপে কল্পনা করা হয়। দীর্ঘ, নিয়ত-তৎপর, অত্যুর্বর যৌনেন্দ্রিয় থাকার জন্য বৃষও

কালক্রমে তাহার আরোহীর সহিত একাসনে লোক-পূজার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে।

লিঙ্গপূজার উৎপত্তি ও ইতিহাস যথাস্থানে সবিস্তারে বর্ণিত হইবার জন্য তুলিয়া রাখিয়া, এ স্থলে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখি যে, প্রাচীন ভারতে —কি বৈদিক, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-যুগে—কি পৌরাণিক ও বৌদ্ধ-যুগে, যৌনজ্ঞানে ভাবগত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে পারদর্শিতা লাভের শত পন্থা উন্মুক্ত ছিল। সর্ববিদ্যায় বিশারদ হইয়াও যিনি কামশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিতেন, তিনি পণ্ডিত-সমাজে উচ্চাসন লাভ করিতে পারিতেন না। অথর্ববেদে ও আয়ুর্বেদে কামচর্যা ও সঙ্গম-সুখ-বৃদ্ধির জন্য প্রক্রিয়া ও ওষধির অন্ত নাই। রাজা-প্রজা সকলেই সেগুলিকে কাজে লাগাইতে সাধ্যমতো তৎপর ছিলেন।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যা

উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই যে, পঞ্চাল-রাজ প্রবাহন জৈবালি প্রমুখ বহু রাজর্ষি তৎকালে 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়' পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন; দেশ-বিদেশ হইতে আরুণি গৌতমের মতো বহু পণ্ডিত তাঁহাদের শিক্ষায়-তনের দ্বারে আসিয়া ভিড় করিতেন। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাটি কি তাহার সংজ্ঞা আমরা বৃহদারণ্যকে সুস্পষ্ট জানিতে পারি।…"যোষা বা অগ্নির্গৌতম, তস্যা উপস্থ এব সমিল্লোমানি ধূমো যোনি রর্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতাস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সম্ভবতি।—(বৃ. ষষ্ঠ অধ্যায়, ২য় ব্রাহ্মণ, ৩৯১।১৩)

ইহার বাংলা অর্থ দাঁড়াইতেছে এইরূপ,—'হে গৌতম, স্ত্রী হইতেছে পঞ্চম অগ্নি। উপস্থই তাহার সমিধ। লোমসমূহ তাহার ধূম, যোনি তাহার

অর্চি (শিখা), কবলিত করা বা রতি-ব্যাপার পরিচালন তাহার অঙ্গার-সমূহ, ক্ষুদ্র পুলকোচ্ছ্বাসগুলি তাহার স্ফুলিঙ্গবিশেষ। এই অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ আহুতি প্রদান করেন অর্থাৎ মৈথুনক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সেই আহুতি হইতে হস্তপদাদিযুক্ত স্থূলদেহ পুরুষ প্রাদুর্ভূত হয়।'

বাৎস্যায়নের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগ

তৃতীয় বা দ্বিতীয় খৃষ্টপূর্ব শতকে বাৎস্যায়ন জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন—"শরীরস্থিতিহেতুত্বাদাহার সধর্মানো হি কামাঃ ফলভূতাশ্চ ধর্মার্থয়োঃ। বোদ্ধবস্ত দোষেষিব।" (—শরীরের স্থিতি করে বলিয়া কাম আহার-ব্যাপারের সহিত সমভাবে তুলনীয় ও ধর্মার্থের সহিত একপর্যায়-ভুক্ত; আহারের দোষে যেরূপ শরীর নষ্ট হয়, বিহারের দোষেও সেইরূপ দেহের পতন ঘটে জানিবে।) বাৎস্যায়নের জীবনকালের বহুপূর্বেই শ্বেতকেতু, বাভ্রব্য, ঘোটকমুখ, চারায়ণ. গোনার্দীয়, দত্তক প্রমুখ বহু মহাজন যৌনজ্ঞান সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। সে জ্ঞানের আলোকে তখন আর্য গৃহস্থের জীবনের রাজপথ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ জাতক সেই জ্ঞানরশ্মির উপর একটা লজ্জার আস্তরণ টানিবার প্রয়াসে ব্যর্থ হইয়া, একটা বিকৃত কৃত্রিম আব্‌ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা এই পুস্তকের যথাস্থানে রামায়ণ, মহাভারত ও জাতক-রচনার যুগে জনসাধারণের মধ্যে যৌননীতির কিরূপ ব্যবহার ছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিব।

শঙ্করের পরাজয়

আমরা জানি, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ শঙ্করাচার্য মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতীর নিকট তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, যখন প্রেম ও কাম সম্বন্ধে নিজের দারুণ অজ্ঞতার পরিচয় দিলেন, তখন পণ্ডিতপত্নী তাঁহাকে উপহাসের লঘু হাস্যে অধোবদন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কিম্বদন্তী বলে—অতঃপর এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের আত্মা কিছুকালের জন্য নিজ দেহ ছাড়িয়া, মরণোন্মুখ রাজা অমরকের দেহাশ্রয় করিয়া, বিভিন্ন ব্যবহারিক উপায়ে কাম সম্বন্ধে বৈদগ্ধ্য অর্জন সুরু করিয়া দিয়াছিল।...

বসনের জন্মকথা

আধুনিক ভব্য সমাজে—বিশেষভাবে মহিলাদিগের মধ্যে, পোষাক-পরিচ্ছদের প্রশ্ন তাহাদের চিন্তা ও কর্মের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। পোষাকের নিত্যনূতন ফ্যাশন শুধু পরিধানকারীর আত্মতৃপ্তির মুখাপেক্ষী হইয়াই কি উদ্ভব লাভ করে? অধ্যাপক গ্রসি তাঁহার *"Anfange der Kunst"* নামক গ্রন্থে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, আদিমযুগের অসভ্য মানুষের মনে পরিধেয়ের কামনা সর্বপ্রথম জাগে যৌনপ্রবৃত্তির বিকীরণবশত। যে নগ্নগাত্রেই লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছিল, অকস্মাৎ তাহার মনে স্বাস্থ্যরক্ষার অজুহাতে নিজেকে আবৃত করিবার বাসনা নিশ্চয় জাগিয়া উঠে নাই। নিজের দেহকে শোভিত করিবার মৌলিক উদ্দেশ্য লইয়াই বৃক্ষপত্র, বৃক্ষবল্কল, পশুচর্ম, অস্থিখণ্ড বা প্রবাল-মালা দিয়া আদিবস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। শোভার জন্যই বসনের সৃজন বলিয়া, উহার আর এক নাম সজ্জা।

বস্ত্রের প্রথম অবলম্বন—কটি ও জঙ্ঘা

এত অঙ্গ থাকিতে আদিম বসন কটি ও জঙ্ঘাকে বেড়িয়া ধরিল কেন? কারণ সুস্পষ্ট,—কটির নিম্নেই যৌন আকর্ষণের সর্বাপেক্ষা অমোঘ সামগ্রীটি রক্ষিত। অপর যৌনধর্মীদিগকে উহার প্রতি আকৃষ্ট করাই ছিল সজ্জার আসল লক্ষ্য। মানুষের অঙ্গের বা গৃহের যে স্থানটি যত বেশি আবৃত থাকে, তাহা তত বেশি দর্শকের কৌতূহল জাগায়। অবগুণ্ঠন ও বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারের উদ্ভবও খুব সম্ভবত অনুরূপ অভিপ্রায়ের মধ্য হইতে। মর্টিমার বলিতেছেন, অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন অংশের আদিম অধিবাসীদের নারীরা বিবাহের পরই বিবস্ত্র হইয়া চলাফিরা করে, কারণ তখন আর তাহাদিগকে কাপড় পরিয়া পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়োজন হয় না।

বসন ও লজ্জাশীলতা

নরনারীর কেশ-বেশ-বিন্যাসের আসল অর্থই হইল পরস্পরের চিত্তকে প্রলুব্ধ করা; উহার মধ্যে সরম-সঙ্কোচের প্রশ্ন পরে আসিয়াছে। জেম্‌স্ তাঁহার মনস্তত্ত্ব বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থের (Psychology II, 1890, p. 449) একস্থলে বলিয়াছেন—"emotions follow and do not precede the bodily state." কথাটা অন্য কোন ক্ষেত্রে খাটুক বা না খাটুক, বস্ত্রের উদ্ভাবন-ক্ষেত্রে চমৎকার খাটে। মনে লজ্জা জন্মিবার ফলে আমাদের পূর্বপুরুষগণ বস্ত্রের সৃষ্টি করেন নাই, বরং বস্ত্র-উদ্ভবের ফলে কালক্রমে লজ্জা আসিয়া সলজ্জভাবে আমাদের বরাঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

পোষাকের যৌন আবেদন

সভ্যতার উন্মেষকাল হইতেই বস্ত্রের ফ্যাশন নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে ধনী বিলাসিনী ও উচ্চ শ্রেণীর গণিকাদলের দ্বারা। আজও নিউইঅর্ক, ভিনিস্, প্যারিস্, রোম ও লণ্ডনে এই শ্রেণীর নারীদের মস্তিষ্ক হইতে নিত্যনূতন খেয়াল প্রসূত হইয়া, পোষাকের কাট-ছাঁট-ঝুল্ ও বর্ণবৈচিত্র্যের পরিবর্তন ঘটাইয়া দিতেছে। আজকালকার সর্বদেশীয় মেয়েদের পোষাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অপরের স্তুতি অর্জন বা লালসা উদ্দীপনের উদ্দেশ্যেই উহার জন্ম। আধ-ঢাকা, আধ-প্রকাশের মধ্যে যে একটা আবেশময় আগ্রহ-সঞ্চারের অনুরণনা আছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সায়া-সেমিজ পরিবার প্রথা ছিল না; উপরন্তু সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, মৃদু বায়ু-ভরে দোদুল্যমান একখানি সাড়ী দিয়া সর্বাঙ্গের সুকুমার লজ্জারাশি ঢাকিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহাতে লজ্জার মধ্য দিয়া নির্লজ্জতা প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাইত।

বক্ষের মূক ভাষা

বার্গ্ বলেন,—স্ত্রীলোকের বক্ষঃপ্রদেশ এমন একটি অঙ্গ, যদ্দ্বারা সে নিতান্ত অনাড়ম্বর কৌশলে নিজেকে প্রকাশ ও প্রচার করিতে পারে। বুকের উচ্চাবচতা চিরকাল ধরিয়া হইয়া আছে তাহার অন্তঃকরণের ভাবদ্যোতক নীরব মঞ্জুল ছন্দ। নারীর পয়োধরযুগ তাহার আশা ও ভাষার জীবন্ত আলেখ্য, মর্মের সঙ্গীত, কর্মের ইতিহাস, জীবনের বৈশিষ্ট্য, গর্বের সামগ্রী। কাজে কাজেই বস্ত্রালঙ্কারের যত কিছু পারিপাট্য, এই দুটিকেই কেন্দ্র করিয়া যদি গড়িয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে

তাহাতে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। কর্সেট্, ব্লাউজ, কাঁচুলি প্রভৃতির আকারে-প্রকারে বৈচিত্র্য-বিধানের আর বিরাম নাই। হার, লকেট, পেণ্ড্যান্ট্, মুক্তামালার কত রকমেরই না ছাঁদ বাহির হইতেছে।

সাধ্বী মহিলাগণ হয়তো অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞাতসারেই হাল-ফ্যাশন অনুযায়ী বস্ত্রালঙ্কারের তাগিদকে বলবৎ রাখিয়া চলেন। ইহা হয়তো তাঁহাদের কাছে তুচ্ছ খেয়াল, অকপট বিলাসিতা, পরানুকরণ-প্রবৃত্তি—হয়তো বা অসূয়া অথবা আত্মম্ভরিতা প্রকাশের সহিত দৈহিক সৌন্দর্য-বৃদ্ধির প্রকৃষ্টতম উপায়ন। কিন্তু যেভাবেই হোক্ সজ্জার আড়ম্বর দৈহিক সৌন্দর্য অপেক্ষা মানসিক ভাবকে অধিকতর পরিস্ফুট করে, ব্যক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিত্বকে বেশি করিয়া জাহির করে, সভা-মজলিসে আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিবার—স্ত্রীপুরুষের মুগ্ধ বিস্ময় জাগাইয়া তুলিবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে দেয় না।

যৌনবৃত্তির আধুনিক পরিণতি

সঙ্গীত, শিল্প, ভাস্কর্য সাহিত্য প্রভৃতির তো কথাই নাই, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন গদ্যময় জীবনযাত্রার প্রতি পদে প্রেম ও যৌনাকর্ষণ গোপনে ও প্রকাশ্যে কত খেলা খেলিতেছে, তাহা হয়তো অনেকের কাছে সম্পূর্ণভাবে জানা নাই; তাহাদের দূরপ্রসারী প্রভাব ও তাহার পরিণতি সম্বন্ধেও খোঁজ রাখিবার হয়তো কাহারো অবসর নাই। মধ্যযুগের ধর্মের গোঁড়ামি ও আধুনিক কৃষ্টি মানুষের স্বভাবজাত কামতৃষ্ণাকে টুঁটি টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। বরং তুষের আগুণের মতো উহা লোক-লোচনের অন্তরালে একটু একটু করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে এবং বহুরূপী-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। যৌন

আকর্ষণে জাগিয়াছে ক্ষণিকের নেশা, প্রেমে আসিয়াছে কাপট্য, কামে আসিয়াছে শাঠ্য, দাম্পত্য জীবন গড়িয়া তুলিতেছে বিয়োগান্ত নাট্য!

উপরে মিথ্যা লজ্জার ভাণ, ভিতরে অজ্ঞতাপ্রসূত সীমাহীন কৌতূহল। ঐতিহ্যগত সংযমের অভাবে একদিকে দেখি অজস্র রুচি-বিকারের গুপ্ত প্রবাহ, অন্যদিকে পারিবারিক শিক্ষার দৈন্যে ও পরানুকরণ-স্পৃহার পুণ্যে বাহ্যিক বিলসনের দুরন্ত মোহ। সভ্যতা মানুষকে তাহার সত্যকার রূপ ঢাকিতে শিখাইয়াছে, একান্ত অন্তরঙ্গের নিকট হইতেও আপন এষণা ও উদ্দেশ্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার প্রবৃত্তি দিয়াছে, নিজের সামান্য দুর্বলতাকে উচ্চকণ্ঠে অস্বীকার করিবার কৌশল বলিয়া দিয়াছে।

স্ত্রীলোকের যৌনবিষয়ক ব্রীড়া

স্বাভাবিক যৌনাকাঙ্ক্ষাকে দমন করিবার মিথ্যা প্রয়াস পাওয়া ও যৌনবোধকে একটা গভীর লজ্জার আস্তরণে মুড়িয়া রাখা—বহুকাল পূর্ব হইতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একটা সাধনার বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। স্বামীর নিকটও নিজেকে অপ্রকাশ রাখিবার—যৌনসম্মিলন-কালে স্বতোৎসারিত কাম-তোষণের লক্ষণগুলি স্ফুরিত হইতে না দেওয়ার একটা অভ্যাস বহু সুশীলা নারীর মধ্যে এখনো বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। ইহার ফল যে সকল সময় কল্যাণপ্রদ হয় না, তাহা আমরা প্রসঙ্গত বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পুরুষের মধ্যেও চিরকাল একদল যৌন-বিষয়ে যথাতিরিক্ত ভণ্ডামি দেখাইয়া, অথবা কায়িকভাবে ধ্বজবীর্য হইয়া, অপরের নিকট হইতে সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট লাভ করা জীবনের একান্ত কাম্য বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে; এখনো সে প্রবৃত্তি একেবারে অপসৃত হয় নাই।

সাধুর অন্তরের প্রতিচ্ছবি

সত্যকার সাধুর মনোবিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থলে ঈশ্বর-চিন্তা ছাড়া অনেক আপত্তিকর ও অনিষ্টকর ভাবনা মুখ লুকাইয়া আছে। সে ভাবনা কখনো স্বমূর্তিতে, কখনো বা ছদ্মবেশে তাঁহার মানস-দেবতার দ্বারে আসিয়া করাঘাত করে; তাঁহার বোধন-ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলে, পূজাবেদী কলুষিত করিয়া দেয়। পুরাণে ভক্তমনের এই কুচিন্তা ও দুশ্চিন্তাগুলিকেই বোধহয় দৈত্য-দানব-রাক্ষস প্রভৃতির আকার দেওয়া হইয়াছিল। আজকালকার সস্তার ব্রহ্মচারী ও ভণ্ড সাধুদের গুপ্ত কামাচার ও রুচিবিকারের রোমাঞ্চকর প্রতিবেদন ভূরি ভূরি সংগ্রহ করা কিছু কষ্টসাধ্য নহে।

যাঁহারা নারীকে, এমন কি নিজের স্ত্রীকে পর্য্যন্ত ভালবাসিতে পারেন না—কোনরূপ যৌনাবেগ দ্বারা বিচঞ্চল হন্ না বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারাই আবার গোপনে নিজের অসামর্থ্য বিদূরিত করিবার নিমিত্ত নানারূপ ঔষধ ও কৃত্রিম প্রক্রিয়ার শরণ লন্; নতুবা তাঁহারা নির্জ্জাতভাবে স্বপরিবারস্থ কাহারো প্রতি অথবা সমযৌনধর্ম্মী কাহারো প্রতি কামানুভূতি-জনিত সংস্থিতিতে চিরনিবদ্ধ হইয়া থাকেন। যাহারা গোপনে প্রেম বিষয়ক যথেচ্ছাচারিতা ও প্রকীর্ণসম্ভোগে কালাতিপাত করিয়া আনন্দ পায়, তাহারা ভদ্র-সমাজে যৌনবিষয়ক সামান্য প্রকাশ্য আলোচনায় যোগ দান করিতে ঘৃণা বোধ করে, অর্থাৎ প্রকারান্তরে ভয় পায়—পাছে সেই আলোচনার স্বচ্ছ সলিলে তাহাদের আপন স্বভাবের আংশিক প্রতিফলনও প্রকটিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য আজকালকার যৌনবৈজ্ঞানিকগণ যে একবাক্যে বলিতেছেন—"The excessive prude is generally

at heart a sensualist,"—কথাটাকে একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

চূড়ান্ত অজ্ঞতা ও তাহার কুফল

অশ্লীলতা ও লজ্জাশীলতার দোহাই দিয়া, বহুকাল যৌনবিষয়ক প্রশ্নের সম্মুখে যে কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা এ প্রগতির যুগ নির্ম্মম ব্যগ্রতায় টানিয়া খসাইতে চাহিতেছে। এখনকার যুবপ্রাণ বুঝিতে পারিয়াছে যে, স্বাস্থ্য, সুখ, সমৃদ্ধি ও পারিবারিক শান্তি—এই প্রশ্নের সুমীমাংসা ও তাঁহার সুপ্রয়োগের উপর নির্ভর করিতেছে। স্বাভাবিক যৌনবৃত্তির প্রসাদন স্বভাবসঙ্গত প্রণালীতে পরিচালিত করিবার যে জ্ঞান পুরাযুগে মুষ্টিমেয়ের নিকট জ্ঞাত ছিল এবং বর্তমান বিজ্ঞান যে জ্ঞানের উপর নূতন আলোকপাত করিয়া তৎসহিত বহু অচিন্তিতপূর্ব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে, সেই জ্ঞান আপামর-সাধারণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের হরিনামের মতোই বিতরণ করা আবশ্যক ;—কলৌ নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা। যৌনজ্ঞানের অভাব যে কত নরনারীর—কত সংসারের আনন্দ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা হরণ করিয়া লইতেছে, তাহার কয়েকটি জলন্ত উদাহরণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইবে।···

সরকারী পেন্সন্‌ভোগী তেষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ—তিতাল্লিশ বৎসর কাল বিবাহিত জীবন যাপন করিতেছেন, অথচ স্ত্রীলোকের মূত্রনালী ও যোনি-নালী যে পৃথক তাহা জানেন না। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স্ক, একাদশ সন্তানের জননী পুরুষের বীর্যে সূক্ষ্মদেহী শুক্রকীট থাকে, তাহা অবগত নহেন। ইহাতে হয়তো আশ্চর্য হইবার কারণ কেহ কেহ খুঁজিয়া পাইতে না পারেন। কিন্তু যদি বলা যায় যে, শিক্ষিত পরিবারে এমন বর্ষিয়সী

স্ত্রীলোকও আছেন যিনি জরায়ু নামক একটি বিশিষ্ট আশয়ে ভ্রূণদেহ সৃষ্ট হয়, তাহা সতেরো বৎসর ব্যাপী দাম্পত্য জীবন যাপন করিবার পরও জ্ঞাত ছিলেন না, তাহা হইলে অবশ্য বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না।

অজ্ঞতা ও কুসংস্কার যে সমাজের কতখানি ক্ষতি করে, তাহা আমরা অনেক সময় ভাবিয়া দেখি না। শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সর্ব-স্তরের লোকের মধ্যে একটা ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, প্রমেহদ্বারা সদ্যাক্রান্ত ব্যক্তি যদি এক বা ততোধিক অল্পবয়স্কা কুমারীর সহিত সহবাস করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ঐ কাল-ব্যাধি অচিরে নিরাময় হইয়া যায়। এমন কি, ইয়োরোপ, আমেরিকার ন্যায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-সমাকীর্ণ দেশেও এই সর্বৈবমিথ্যা পরিজ্ঞানের অসংখ্য পূজারী আছে। এতাবৎ এই জঘন্য কুসংস্কার যে কত লক্ষ সুকুমারী বালিকার সতীচ্ছদ-ছেদনে ও প্রায়-দুরারোগ্য প্রমেহব্যাধির সংক্রামণে সহায়তা করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কয়েকদিন পূর্বে শ্লাঘনীয় ডিগ্রী ও উপাধিধারী জনৈক ষাট বৎসর বয়স্ক অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক, বিপত্নীক অবস্থায় প্রমেহাক্রান্ত হইয়া, পেটেণ্ট ঔষধের দ্বারা গোপনে আত্মচিকিৎসা করিতেছিলেন। দুই মাসের চিকিৎসায় কোন ফলোদয় না হওয়ায় তিনি শঙ্কিত ও ধৈর্যহারা হইয়া পড়েন। সেই সময় তাঁহার এক বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী বেরিবেরি-জনিত চক্ষু-রোগের চিকিৎসার জন্য তাঁহার গৃহে একটি ছয় বৎসরের কন্যা লইয়া অবস্থান করিতেছিল। ঐ দৌহিত্রীস্থানীয়া শিশু-কন্যাটিকে ভুলাইয়া একদিন বৃদ্ধ আপন রোগ-প্রতীকারের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন।

ঘটনার অব্যবহিত পরে শঙ্কাবিমূঢ় মেয়েটি তাহার মাতাকে গিয়া সমস্ত ব্যাপার বলিয়া দেয়। ইহাতে বাড়ীময় একটা হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। মাতা

তাহার কন্যার হাত ধরিয়া তখনই পুলিসের শরণাপন্ন হ'ন্। মেয়েকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য পরদিন সকালে যথাস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষায় তাহার সতীচ্ছদের কয়েক স্থান ঈষৎ ছিন্ন ও শুষ্ক রক্তরেখাময় দেখা গেল, এবং যোনিনালীর মধ্যে গনোকক্কাই বীজাণু প্রচুর সংখ্যক পাওয়া গেল। শুনিয়াছি, বৃদ্ধের পুত্র ও জনৈক বন্ধুর মধ্যস্থতায় ব্যাপার আর আদালত পর্যন্ত গড়ায় নাই। কয়েক শত টাকার খেসারৎ পাইয়া, নিজের পীড়িত চক্ষু লইয়া এবং ঘৃণ্য ব্যাধিগ্রস্তা হৃতকৌমার্য কন্যার হাত ধরিয়া, অবীরা মাতা বাষ্পাকুললোচনে দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন।

প্রেমাতঙ্ক রোগের লক্ষণ ও নিদান

লোকলজ্জার ভয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের অনুদার নীতি এবং নিজের স্বভাব গোপন করিবার অবিচ্ছিন্ন প্রয়াস—এই সকল কার্যকারক মিলিয়া আধুনিক fig-leaf modesty ও prudery'র জন্ম এবং একশ্রেণীর লোকের মধ্যে যৌনাতঙ্ক রোগের বীজ ছড়াইয়া দিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তাহারা প্রেম সম্বন্ধীয় কোন কথা শুনিলেই তোবা বলিয়া কানে আঙুল দেয়, সামাজিক আদর্শ-ছাড়া কাহারো যৌনজীবনের ধারা বিভিন্নরূপ দেখিলে গর্হিত বলিয়া তারস্বরে চিৎকার করিতে থাকে। অথচ নিত্য নূতন কলঙ্ক কাহিনীর চিন্তা হয় তাহাদের মনের মুখরোচক খাদ্য, তাহাদের আপন কল্পনা হয় তলে-তলে কুষ্ঠগ্রস্ত, নৈতিক চরিত্র হয় আশাতীতভাবে শিথিল।

ইহাদের মধ্যে অনেকেই উপরে ধর্মের ধ্বজা উড়াইয়া গোপনে সংগ্রহ করিয়া রাখে নগ্ন কামলীলাপ্লুত ফরাসী কার্ড, দেবমন্দির-গাত্রে প্রাচীন প্রস্তর-খোদিত মূর্তি দেখিয়া হয় পুলকে আত্মহারা। বিদ্যালয়গামিনী

ক্ষুদ্র বালিকার অনাবৃত হস্ত-পদ, গঙ্গাস্নানরতা প্রৌঢ়ার সিক্তবসন, শিখ মোটর-চালকের হ্রস্ব আণ্ডারউয়্যার অথবা কাপড়ের দোকানের আলমারিতে সুসজ্জিত জীবিতাকার পুতুল—ইহাদিগের মনে কামচিন্তা জাগাইয়া তুলে। তাহারা যেদিকে যায়—যেদিকে চায়, সেইদিকে কামের প্রতিচ্ছবি, কামনার হাতছানি দেখিতে পায়। একপ্রকার অজানিত-ভাবেই তাহারা তাহাদের ব্যাধিগ্রস্ত মনোবৃত্তি ও পাপস্পৃষ্ট বিবেকের পঙ্কিল চিহ্ন অবিনশ্বর ভাস্কর্য, অপরূপ চিত্রশিল্প ও অনিন্দ্য সাহিত্য-সৃষ্টির গাত্রে আঁকিয়া দেয়।

এই সকল জবরদস্ত্ নীতিবাদীর কয়েকজনের জীবনের ইতিহাস আমাদের দপ্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং দুই-চারিজন ব্যক্তি যৌনবিষয়ক অসুবিধার প্রতীকারার্থ আমাদের শরণাপন্নও হইয়াছেন। কথিত শ্রেণীর কৃত্রিম লজ্জাশীলতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্লীলতা-বোধ এতকাল যৌন-বিষয়ক প্রশ্ন লইয়া বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও তদুপরি জ্ঞানালোকপাতের পথে অনেকখানি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়াছে। এখনো কোনো কোনো দেশে চিকিৎসাবিদ্যার কলেজ হইতে প্রজননতত্ত্ব পরিবর্জিত হইয়া রহিয়াছে; কোনো কোনো বিদ্যালয়ে অতি সন্তর্পণে, একান্ত সঙ্কোচের সহিত ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিতরণ করা হয়। ইঁহারা চান্ যে, যৌনবিষয়ক অজ্ঞতা যুগ-যুগান্ত ধরিয়া আমাদের নিকট বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ থাকুক; অজ্ঞতার মধ্যে জাতি বাঁচিয়া ছিল, বাঁচিয়াও থাকিবে।...

কিন্তু তাঁহাদিগকে বুঝাইবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, অজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান দুই দিক্ হইতে প্রায় সমভাবেই জাতির সর্বনাশ করে, এবং যৌনবিষয়ক মূঢ়তা ও আত্মম্ভরিতার ফলে রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের যত কিছু সর্বনাশ ঘটিয়াছে, তত সর্বনাশ আর পাঁচটি রিপুতে সাধন করিতে পারে

নাই। সামান্য একটু জ্ঞান ও সুবুদ্ধি প্রয়োগের অভাবে তথাকথিত সভ্য ও অর্ধসভ্য জগতের অল্পাধিক আটত্রিশ কোটি অধিবাসীর দেহ আজ কদর্য রতিজ ব্যাধির বিষ বহন করিতেছে। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ শিশু, লক্ষ লক্ষ নিষ্পাপ নারী—পিতা ও স্বামীর মূর্খতায় গনোরিয়া-সিফিলিস্-জনিত নানারূপ জটিল রোগে জীবন্মৃত হইয়া, দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করিতেছে। তবুও কি আমরা অজ্ঞতাকে আশীর্বাদ বলিয়া শিরে ধরিয়া থাকিব?

চিকিৎসকের মূর্খতা ও নিশ্চেষ্টতা

আমাদের দেশের চিকিৎসককুলের অজ্ঞতা, উদাসীনতা ও গোঁড়ামি যেমন ভয়াবহ, তেমনি শোচনীয়। অ্যানাটমি ও ফিজিঅলজি তাঁহাদিগকে যৌনেন্দ্রিয়ের সংস্থান ও কার্যাবলী সম্বন্ধে যেটুকু শিক্ষা দিয়াছে, সেটুকু তাঁহারা সামাজিক ও পারিবারিক কুসংস্কারের ছোঁয়াচ্ পাইয়া অল্পাধিক বিকৃত করিয়া ফেলেন। যৌনতত্ত্বগত মনোবিশ্লেষণ সম্বন্ধে, ফ্রয়েড্ ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মতবাদ সম্বন্ধে, সমাজতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের সহিত যৌনবিজ্ঞানের যোগাযোগ সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা অস্পষ্টও বটে, অগভীরও বটে। প্রেমের নৈতিক ও ব্যবহারিক দিক্ বিষয়ে তাঁহাদের ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা অপরের নিকট বরণীয় নহে; তাঁহাদের অধ্যয়নও সীমাবদ্ধ—উপদেশও গোঁজামিলের নামান্তর। বাংলাদেশের শতকরা একজনও শিক্ষিত ডাক্তার হ্যাভ্লক্ এলিসের "Studies in the Psychology of Sex" নামক ভুবনবিদিত গ্রন্থাবলীর পাতা উল্টাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

এমন কৃতবিদ্য ডাক্তারও এখানে আছেন, যিনি Interstitial cells

of Leydig কাহাকে বলে জানেন না, মেয়েদের hysteria'র প্রধান কারণগুলি কি বলিতে পারেন না, সিফিলিস্-নিবারক ঔষধাবলীর নাম অবগত নন্—যিনি flagellation, fellatio ও Capote Anglaiseএর নাম কখনও শুনেন নাই; অথচ হাঁপানির কি কি বিলাতী পেটেণ্ট গত দশ বৎসরের মধ্যে বাজারে বাহির হইয়াছে, তাহার নাম গড়্‌গড়্ করিয়া মুখস্থ বলিতে পারেন। স্বতঃ-অধিকারী হইয়াও ডাক্তার যে যৌনতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষিত হইবার ও শিক্ষা দিবার সুযোগ নষ্ট করিতেছেন, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগকে বোধহয় বেশি আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

চিকিৎসকগণ রতিজ ব্যাধিদ্বারা একাধিকবার আক্রান্ত হইয়াছেন, রোগিনী পরীক্ষা করিতে গিয়া তাহার উপর লালসালোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ অথবা তাহার সম্ভ্রমহানি করিয়াছেন, ধাত্রী, নার্স অথবা নিম্নজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপনের পরিণামে খোরপোষের দাবিতে আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন, পত্নীকে ধনী বন্ধুর সহিত বিশ্রম্ভ করিতে প্ররোচিত করিয়াছেন, বেশ্যাপল্লীতে একই গৃহে পাশাপাশি পত্নী ও রক্ষিতা রাখিয়া পুত্রকন্যাদিগকে দুর্নীতিকর আবহাওয়ার মধ্যে নিরুদ্বেগে মানুষ করিতেছেন···এরূপ দৃষ্টান্তের সন্ধান বন্ধু-মহলে বা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

প্রেম সম্বন্ধে গড়্‌পড়্‌তা ডাক্তার ও তাঁহার রোগী একই নৌকায় সহযাত্রী,—তাঁহারা একযোগে তীরে উঠেন বা জলে পড়েন। যে মুষ্টিমেয় চিকিৎসক এ বিষয়ে উদাসীনতা, অল্পজ্ঞান বা নিন্দার্হ অভিযোগের স্পর্শলেশশূন্য, তাঁহাদের দৃষ্টিপ্রসর যেমন উদার, অধ্যয়ন-স্পৃহা, পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও বহুদর্শিতা তেমনি সুগভীর ও বহুমুখী।

বর্তমান পুস্তকের বিস্তারণ-কালে তাঁহাদের সহযোগিতা আমরা সাগ্রহে আমন্ত্রণ করিব।

গুরুর আসনে কবি ও সাহিত্যিক

সর্বদেশে কবি উপন্যাসিক ও নাট্যকার প্রেম ও তাহার বিচিত্র বিকীরণ সম্বন্ধে জ্ঞান-প্রচারের ভার স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তুলিয়া লইয়াছেন। ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্য দিয়া তাঁহারা জীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাই হয় তাঁহাদের প্রাথমিক মূলধন। ইতিহাস ও জনশ্রুতির উপর তাঁহারা কতকটা নির্ভর করেন সত্য, কিন্তু আপনাদের খুশিমতো তাহাকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লন্। অসাধারণ কল্পনাশক্তির বলে তাঁহারা প্রেমকে সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে লইয়া যান্; নচেৎ উহাকে শুধুই তপ্ত অশ্রুজল, ব্যর্থতার বেদনা ও বিশ্বাসঘাতকতা-ভরা একটা পরিত্যজ্য প্রবৃত্তি বলিয়া চিত্রিত করেন। তাঁহাদের চিত্রে থাকে অসংযত অতিরঞ্জন, অদ্ভুতলভ্য স্বপ্নের আবেশময় জড়িমা ও দার্শনিকের উদার দূরদৃষ্টি। প্রেমের যথাযথ ব্যাখ্যা তাঁহাদের হস্তে হওয়ার আশা করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

তদুপরি, তাঁহারা প্রেমকে যেখানেই একটু প্রাকৃত পরিবেশ দিতে গিয়াছেন, সেখানেই আপন ব্যক্তিত্বকে উন্মুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন; ব্যক্তিগত প্রেম-জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকেই রূপে, রসে, ছন্দে ও ব্যঞ্জনায় আমাদের নিকট হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতাগুলি যে বৈকুণ্ঠের প্রতিচ্ছবি নহে, অনূত মর্ত্যবাসীর চির মিলনবিরহ-রসাপ্লুত জীবন্ত আলেখ্য—তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সেইজন্য তাহাদের আবেদন সহজেই আমাদের মনের মণিকোঠায় পৌঁছায় এবং

সেইজন্যই শাশ্বতকাল ধরিয়া তাহারা মানুষের সমাদর পাইতে থাকিবে। মহাজনগণ নিজেরা পরকীয়া-রস আকণ্ঠপান করিয়া, তবে তাহার দিব্য মহিমা এমন মনোজ্ঞভাবে তাঁহাদের পদাবলীর মধ্যে স্ফুরিত করিয়া গিয়াছেন।

নারীর প্রেমই যে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের কবি-জীবনে অনুপ্রাণনার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, তজ্জন্য লোক-প্রবাদের সন্দেহসঙ্কুল বনানীর মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন হইবে না, তাঁহাদের কবিতার চরণে-চরণে ভণিতায়-ভণিতায় তাহার প্রমাণ জাগিয়া রহিয়াছে।

চণ্ডীদাসের "শুন রজকিনী রামী, ও দু'টি চরণ শীতল বলিয়া শরণ লইনু আমি" ইত্যাদি পদ, অথবা বিদ্যাপতির

গগনে উদয়ে কত তারা।
চাঁদ আনহি অবতারা।
আন হি কহব বিশেখি।
লাখ লখমিচয় লখি না লখি।
শুন ধনি মম হৃদি ঝুর।
তবহি মনহি মনপুর।
বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল।
শুনইতে ধন সবহিঁ ভৈ গেল।...

পংক্তি গুলিতে তাঁহাদের প্রেমিকার নামগুলি রাধানামের ছদ্মবেশ ছাপাইয়া পার্থিব মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে।

"শ্রীমদ্ভাগবতের" উপর হইতে ভক্তিরসের অপার্থিব উত্তরীয়টি খসাইয়া লইলেও তাহার মধ্য হইতে মানুষিক প্রেমলীলার নানা গতি ও রীতির নিখুঁত চিত্র পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। কিন্তু এতাবৎকাল অবুঝ

আপন-ভোলা অন্ধবিশ্বাসী ভক্তদল এই অমূল্য প্রেমগীতি-হার শুধু শ্রীকৃষ্ণের গলায় পরাইয়া অনির্বচনীয় প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন; বৈজ্ঞানিককে তাঁহার বস্তুনিষ্ঠ সন্ধানী দৃষ্টি ফেলিয়া উহার লোকসম্ভাব্য তাৎপর্যটুকু উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার স্বাধীনতা দান করেন নাই। রক্তমাংস-ইন্দ্রিয়বৃত্তিময় দেবতা মদন-মদালসে বিভোর হইয়া প্রেমিকার সহিত 'নয়ন ঢুলাঢুলি লহ লহ হাস, অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাষ' প্রভৃতি যে-সকল ব্যাপারের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িতেছেন, তাহাদের সহিত লৌকিক প্রেমাচরণের সৌসাদৃশ্য দেখাইতে গেলে আর রক্ষা নাই,—অমনি রোষ-কষায়িত লোচনে ঘোরতর আপত্তি উঠিবে! অথচ লৌকিকতার সহজগ্রাহ্য সুপরিচিত রসে সিক্তিত বলিয়াই নীরস ভক্তিতত্ত্ব তাঁহাদের নিকট এত প্রিয় ও কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে—এই সরল সত্যটা তাঁহারা যেন ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া যান্। দেবতার রূপ-লালিত্য ও লীলা-কমল যে মানুষের আত্মজীবনের অনুভূতি-রসের মধ্য হইতে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির অগম্য!

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের যুগ

বৈষ্ণব কবিদের যুগ হইতে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীর যুগ পর্যন্ত, অথবা দাশরথি রায়ের আমল হইতে নিধুবাবুর টপ্পা রচনার কাল পর্যন্ত, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শুধু লৌকিক প্রেমের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, প্রগতি ও পরিণতিরই প্রশস্তি করা হইয়াছে। প্রেমের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাহার বিচিত্র ভঙ্গিমার মৌলিক কারণগুলি বিচার করিয়া দেখিবার সাধ্য ও সাধনা তখন কাহারো ছিল না।

তাহার বীজ আসিল ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে সমুদ্রের পরপার হইতে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ প্রেম-সম্বন্ধীয় বৈদগ্ধ্যে যেমন উন্নত হইল, তেমনি সর্বজাতীয় প্রেমিকের মনে একটা অপূর্ব ভরসা ও সাহসের সঞ্চার করিয়া দিল। নৈতিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও আধিভৌতিক পরিবেষ্টনীর মোহ কাটাইয়া, নিছক্ প্রেম সত্যকার রূপ ও প্রাণ পাইল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে। তাঁহাদের প্রেমের ছবি যেমন ধরিত্রীর কোল-ঘেঁষা, তেমনি বৈচিত্র্যময়; যেমন ভাবদ্যোতক, তেমনি মনুষ্যোচিত ত্রুটি-তারল্যে প্রাণবন্ত।

অসম্পূর্ণ ও অতিরঞ্জিত চিত্র

কিন্তু নাটক বা কাব্যোপন্যাস বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বাহন নহে, উচ্চতর ধ্যানানুসন্ধিৎসা মিটাইবার ক্ষেত্র নহে। উহাতে তত্ত্বের স্বরূপ—ভাষার ঐশ্বর্যে, ভাবের আতিশয্যে ও গল্পের আলপনায় ঢাকা পড়িয়া যায়। দর্শন অথবা শ্রবণের মধ্য দিয়া উহারা যোগায় ক্ষণিকের কান্তিরস—ক্লান্তির অভিরাম প্রতিষেধ; মিটায় সীমাবদ্ধ কৌতূহল—দেখায় অসম্পূর্ণ ও অতিরঞ্জিত চারিত্রচিত্রণের বাহাদুরি। প্রেমকে অথবা নর-নারীর যৌনবৃত্তিকে শব্দ-চাতুর্য-ভরা কাল্পনিক কাহিনীর ভিড়ে এত সহজে চেনা যায় না—ধরা যায় না, কিম্বা তাহার বিবিধ অভিব্যক্তির হেতুবাদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তজ্জন্য সুব্যবস্থিত ও চূড়ান্ত শিক্ষালাভের একটা বিশিষ্ট প্রণালী চাই। তৎসম্বন্ধে আগ্রহ বর্তমান যুগের সভ্য সমাজে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

চাই প্রেমের সম্পূর্ণ রূপ

প্রেমের অতলস্পর্শী গুহার সম্মুখে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া যে তন্ত্র সতর্কতার পর্দা এতদিন সযত্নে টানানো ছিল, তাহা এই যুক্তি-যুগের নরনারীর করাকর্ষণে খসিয়া পড়িয়াছে। প্রেমের পরম রূপ—চরম লক্ষ্যের পথ তাহারা দীপালী-উৎসবের দীপ্তির মধ্য দিয়া দেখিতে চাহিতেছে। বর্তমানে যৌনতত্ত্বের অকপট আলোচনার প্রবল জলোচ্ছ্বাসের আঘাতে বিগত যুগের নেতি ও নিষেধের ঘুণ-ধরা বাঁশের বৃত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এতকাল যে বিষয় লইয়া প্রিয়তম বন্ধুদের সহিত শুধু সংগোপনে কানাকানি চলিত, তাহাই প্রকাশ্য সভায় তর্কের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতি-অজ্ঞতার রাজ্য হইতে এখন জনসাধারণ অতি-বিজ্ঞতার আলোক-সমারোহে প্রবেশ করিতে চাহে। তাই সত্য, মিথ্যা, অতিরঞ্জিত যৌন-বিষয়ক জ্ঞানের প্রখর প্রভাব সম্প্রতি আমরা সাহিত্যে, মঞ্চে, পর্দায়, সাময়িক পত্রে, হাটে-বাজারে সর্বত্র দেখিতে পাইতেছি। সাহিত্যের বাজারেও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের সৃষ্টি হয়।

উদ্দাম আতিশয্যের হেতু

মধ্যযুগের কড়াকড়ি শাসনের পর এই উদ্দাম আতিশয্য অপ্রত্যাশিত নহে। পরিবর্তনের এই অস্থায়ী সন্ধিক্ষণে উহাকে একটু তিতিক্ষার চক্ষে দেখা ছাড়া আর গতি নাই। নবীন যুক্তিবাদ ও নব্যবিজ্ঞান নূতন আলোকের রশ্মিদ্বার খুলিয়া দিয়াছে; তাহাতে স্নান করিবার নিমিত্ত নরনারীর মধ্যে যে তাড়াহুড়া লাগিয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া একদল সংরক্ষণবাদী 'দন্তগলিত পলিতমুণ্ড' বৃদ্ধ লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে মুহ্যমান

হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু একটু স্থিরমস্তিষ্কে বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, যাহা এতদিন আধ-ঢাকা আধ-প্রকাশিত ছিল, তাহাই পূর্ণভাবে প্রকটিত হইতে চলিয়াছে; অর্ধ-বিকশিত কুঁড়ি আজ ফুল্লকুসুমে পরিণত হইতে বসিয়াছে। যে জ্ঞান তখন অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে, অথবা একটা বিশিষ্ট জাতির মধ্যে সংগোপনে মুখ লুকাইয়া ছিল, যাহার সুপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের অধিকার একমাত্র তাঁহাদেরই করতলগত ছিল, সেই জ্ঞান-সুধার ভাণ্ড এখন রাজপথে টানিয়া বাহির করিয়া আপামরসাধারণ কাড়াকাড়ি সুরু করিয়া দিয়াছে।

কৃষ্টির গণতান্ত্রিকতা

ডাক্তার ম্যাক্স্ হোডান্ তাঁহার নব-প্রকাশিত পুস্তকের (*The History of Modern Morals*, tr. by Stella Browne, Heinemann Ld.) এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"Actions at law against Obscenity and Pornography are direct result of democratisation of culture. So long as a small inner circle of the governing class amused itself by spicing sex with literature, all was well. The Courts of princes and prelates up to the end of the eighteenth century were not sanctuaries of morality. But when the masses were able to read, and to choose their reading—danger threatened! Books priced at round about two Guineas are seldom attacked, but six penny pamphlets with equivalent

material—are obscene. The Purity Crusades of the various and numerous societies for the suppression of vice are the negative instruments of our special phase of social development, and therefore dearer far to those in authority over us than the efforts of other progressive societies."...

কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার মতো নয় কি?

সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'আরব্য রজনী'র হুবহু ফরাসী ও ইংরাজী অনুবাদ, রসচটুল টীকা ও কামোদ্দীপক নানা রঙিন্ ছবিসহ যখন তুলট্ অথবা পার্চমেণ্ট কাগজে পেশাদার লিপিকারের হস্তে সযত্ন-লিখিত হইয়া, উচ্চমূল্যে অভিজাত-মহলে বিক্রীত হইতেছিল, তখন উহার মধ্যে অভব্যতার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু যখনই ছাপার হরফে সজ্জিত হইয়া, হাজার হাজারে উহার প্রতিলিপি জনসাধারণের নিকট অল্পদামে বিক্রীত হইতে লাগিল, তখনই প্রজা-নীতির ন্যাসরক্ষকগণের টনক্ নড়িল। গল্পগুলির নানাস্থানে কাট্‌ছাঁট্ হইল, লালসাব্যঞ্জক চিত্রগুলির উপর তীব্র কষাঘাত পড়িল।

বিগত শতাব্দীর শেষপাদে হেনরিক্ ইব্‌সেন, গারহার্ড্ হাউপ্ট্‌ম্যান্, হ্যাভলক্ এলিস্, বার্নার্ড্ শয়ের ন্যায় চিন্তাশীল মনীষীবৃন্দের পুস্তক ইয়োরোপের বহু দেশে অশ্লীল ও অপাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। র‍্যাড্‌ক্লিফ্ হলের *Well of Lonliness* অথবা ডি, এইচ্, লরেন্সের *Lady Chatterley's Lover* এক শ্রেণীর নারীর ক্ষুধিত আত্মার সত্যকার প্রতিচ্ছবি হইলেও তন্মধ্যে বহির্বিবাহিক প্রণয়কেলির খোলাখুলি বর্ণনা আছে বলিয়া সর্বদেশে সরকারী আদেশে

ইহারা অবিক্রেয়—অপাংক্তেয়। অথচ গোপনে গোপনে এই পুস্তকের লক্ষ লক্ষ কপির খরিদ্দার আজও প্রস্তুত হইয়া আছে, এবং কত উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদমর্যাদা-সম্পন্ন লোক যে ইতোমধ্যে নিভৃতে বসিয়া উহাদের রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন—তাহার হিসাব পাওয়া দুর্ঘট।

দুর্নীতি—সেকালে ও একালে

দুর্নীতি ও অশ্লীলতার আধিপত্য তখনো যেমন চলিত, এখনো তেমনি চলিতেছে। তবে তখন উচ্চশ্রেণীর মধ্যে তাহার নির্বাধ গতিবিধি নিবদ্ধ ছিল; এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে তাহা গোপন আলোচনার বস্তু ছিল। এই সমাজ-সাম্যবাদের যুগে—ছাপাখানা ও নাগরিক জীবনের কল্যাণে, উহার প্রচার-ক্ষেত্র ব্যাপক ও অব্যাহত হইয়া পড়িয়াছে। সু ও কু সর্বপ্রকার শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যেই সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরের মানুষের মন আপনাকে সমান উৎসাহের সহিত বিসারিত করিয়া দিয়াছে। ইহা যুগ-প্রগতির অনিবার্য লক্ষণ।

মাতৃকতন্ত্র সমাজের উচ্ছেদ-সাধনের পর দীর্ঘকাল ধরিয়া স্ত্রীজাতির নীতির পরিসীমা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাসনের রুদ্রচাপে হ্রস্ব হইতে হ্রস্বতর হইয়া আসিতেছিল। তারপর যখন তাহারা জাগ্রত হইয়া সমানাধিকার-বাদের বিপ্লবে যোগ দিয়া, বহু আয়াসে পুরুষের নিকট হইতে কিছু সুখ-সুবিধা আদায় করিয়া লইল, তখন আনন্দের আতিশয্যে দিশেহারা হইয়া পড়িল। যে একপার্শ্বিক নীতি-নিষ্ঠা ও অজ্ঞতার অন্ধকূপে তাহারা অসহায়ভাবে পচিয়া মরিতেছিল, সেই অন্ধকূপ ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিবার নেশায় মাতিয়া তাহারা যদি

কিছুকাল কল্যাণের ডাক শুনিতে না পায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বড় বেশি দোষী করা চলে না।

স্ত্রীস্বাধীনতা—এদেশে ও বিলাতে

সর্বক্ষেত্রেই বিজয়-লাভের পর একটা প্রাথমিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্বাধীনতার সমীর-স্পৃষ্ট নারীর প্রেমবিষয়ক স্বেচ্ছাচারের মূলে আপাতত আমরা এই জয়-জনিত অশান্ত আনন্দ-হিল্লোল দেখিতে পাইতেছি। এই আনন্দোচ্ছ্বাসে অবসাদ আসিবে অনতিবিলম্বে। হয় তো তাহারা সত্যকে জানিবার জন্য মিথ্যা পথ বাছিয়া লইয়াছে। কিছুদূর গিয়াই তাহাদিগের ভুল ধরা পড়িবে—বিচার-বুদ্ধি ফিরিয়া আসিবে। অথচ স্বমতপ্রতিষ্ঠ হইয়া সত্যকে চিনিবার উৎসাহ তাহাদের কোনমতেই কমিবে না।

খাঁচার পাখী খাঁচার বাহিরে আসিয়া সোল্লাসে নাচিতে থাকিলে পক্ষীপালকের চক্ষে তাহা প্রথম প্রথম বড় বিসদৃশ ঠেকে; অতঃপর গত্যন্তর না দেখিয়া এই অবস্থার সহিত তাহাকে একটু একটু করিয়া মিতালি পাতাইতে হয়।

বিলাতেও মধ্য-ভিক্টোরিয়ান্ যুগের শেষভাগ হইতে স্ত্রী-স্বাধীনতার বহ্নি একটু একটু করিয়া জ্বলিয়া শেষে দাবানলে পরিণত হইয়াছিল; এডোআর্ডের রাজত্ব-শেষে তাহাদের আংশিক দাবি সমাজ ও রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। তারপর কয়েক বৎসর ধরিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিরুপায় হইয়া নারীর সনাতন আচার-ব্যবহারের অদ্ভুত বৈপরীত্য লক্ষ্য করিতে হইয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধে ও তাহার অব্যবহিত পরের দশ-বারো বৎসর কাল অবস্থা-বিপর্যয়ে সে দৃশ্য ঘোরতর কালিমালিপ্ত

হইয়া পড়িল। এখন আবার উদ্দাম নারী-স্বাধীনতার মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছে সৌম্য শৃঙ্খলা, উপভোগের মধ্যে স্নিগ্ধ সংযম, জ্ঞান-পিপাসার মধ্যে আত্ম-কল্যাণ নিয়ন্ত্রণের মহান সঙ্কল্প। আমাদের দেশেও এ দৃশ্যপটের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সহৃদয় উপদেশ ও সুমধুর জ্ঞানের প্রচার অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে বর্তমান নৈতিক বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাইতে পারে। কিন্তু বিগতযৌবন হিতৈষীর রূঢ় নিষেধবাণী বা বিরুদ্ধাচরণ সে জল-তরঙ্গ রোধ করিতে পারিবে না।

যুগ-প্রগতিতে বৃথা বাধাদান

কম্স্টকের আইন, লর্ড্ ক্যাম্বেলের আইন ইয়োরোপ-আমেরিকার ঘরে ঘরে স্বর্গরাজ্য নির্মাণ করিতে পারে নাই। যতীন্দ্রমোহন সিংহ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ সমাজের দুর্নীতি দমন ও সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াও নরেশচন্দ্র, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র ও প্রবোধের উপন্যাসের প্রতি নিখিলবঙ্গের পাঠককুলের বিতৃষ্ণা জন্মাইতে—শিক্ষিত পরিবারের কুমারীগণের প্রকাশ্যে নৃত্যগীতের মোহ দূর করিতে পারিলেন না কেন?

ইহাদের সাধু উদ্দেশ্যের প্রশংসাবাদ করিয়া, নিবেদন করিতে চাই যে, প্রৌঢ়ত্বের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যৌবনের স্মৃতিকে হয়তো একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছেন। ইঁহারা বোধহয় ভুলিতে বসিয়াছেন যে, মহাপুরুষের আদর্শ জীবন সম্মুখে ধরিয়া ও ধর্মনীতির চোখা বুলি আওড়াইয়া কোনকালে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিটিকে জব্দ করা যায় নাই। বুদ্ধ, শঙ্করও হার মানিয়াছিলেন। যৌন-ভাবের

প্রত্যক্ষ বিকীরণ বা দূরতর প্রভাব নবযৌবনের আশিস্-টীকা-লিপ্ত নরনারীর প্রাণে চিরদিনই সঞ্জীবনী রসের সৃষ্টি করে।

স্ত্রীপুরুষের পরস্পরকে জানিবার, চিনিবার, জয় করিবার ও মুগ্ধ রাখিবার নূতন নূতন কলা-কৌশল ও পন্থা অধিগত করার চেষ্টা সংসারী মানুষের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। আগেকার লোক লুকাইয়া 'বিদ্যাসুন্দর', 'রতিশাস্ত্র' পড়িত—বাই-নাচ, খেম্টা-নাচ, হিজিড়ার নাচ দেখিত—পুরীর মন্দির-গাত্রের চিত্রাবলী অধ্যয়ন করিত। এখনকার লোক তদপেক্ষা উচ্চতর ও নবতর জ্ঞানের গ্রন্থাবলী ও প্রণালী চাহিতেছে—আরো কিছু চিন্তাত্মক, আরো কিছু কল্যাণকর, আরো কিছু রসঘন।

হাতে-কলমে শিক্ষার ফল

রসশাস্ত্র, পদার্থাদি বিজ্ঞান যেমন practical classএ হাতে-কলমে শিক্ষা না করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, আজকালকার পরিণত চিন্তাশীল সমাজ-সংস্কারকগণ বলিতেছেন—যৌনবিজ্ঞানেও মানুষের কৈশোর-কাল হইতে কতকটা হাতে-কলমে অথবা demonstration methodএ শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। অধ্যাপক ডুয়েক্, এলিস্, স্টেকেল, হির্শফেল্ড্ প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ বিস্তৃত অনুসন্ধানের ফলে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কিশোরাবস্থা হইতে যাহারা যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানারূপ পুস্তক পাঠ করিয়া, অথবা সমবয়স্কা অন্যযৌনধর্মীর সহিত সীমাবদ্ধভাবে স্বামী-স্ত্রীর অনুরূপ প্রেমাচরণ করিয়া, সংসারে প্রবেশ করে, তাহারা প্রায়ই বিবাহিত জীবনে সুখী হইয়া থাকে।

যাহারা নৈতিক কঠোরতা ও নেতির সঙ্কীর্ণ খাঁচায় থাকিয়া সশঙ্কচিত্তে মানুষ হয়, দায়ে পড়িয়া মাঝে মাঝে হস্তমৈথুন করে এবং প্রভাতে উঠিয়া সাশ্রুলোচনে শতবার দুর্গানাম জপ করে, তাহারা প্রেমের বাণিজ্যে শুধুই লোকসান খায়—জীবন-যুদ্ধে কেবলই হঠিতে থাকে। ডুয়েক্ একস্থলে (*Sexual Truths*—ed. by W. J. Robinson, Ch. III, p. 200) এতদূর পর্যন্ত লিখিয়াছেন—"Students (অবশ্য কলেজের ছাত্র) who have normal sexual intercourse are in good condition and even the most stupid of them show in the course of the examination an amazing degree of confidence. This type of man succeeds; the udersexed and those who indulge in self-abuse, fail."

বালকবালিকাদিগের অকাললব্ধ যৌনজ্ঞান

কিন্তু দেখিতে হইবে, যৌনজ্ঞান ভাবগতভাবেই হোক্ কিম্বা ফলিত উপায়ে হোক্, একটা নির্দিষ্ট বয়সে উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে অর্জন করা হইতেছে কিনা। কত কম বয়সে নরনারীর যৌনবিষয়ক জ্ঞানলাভ করা উচিত, কতখানি মাত্রায় এবং কাহাদের সহায়তায়—তৎসমূহের উত্তর অবশ্য এই গ্রন্থের বিপুল কলেবরের মধ্যে স্থান পাইবে। তবে আপাতত এই সত্যটুকু পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমরা নিজেদের পুত্রকন্যা সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা সাধারণত পোষণ করি, তাহা বস্তুত ভ্রমাত্মক। অতি অল্প বয়সের বালকবালিকাগণ কতকটা নিজেদের ইচ্ছায় অথবা অপরের প্ররোচনায় যৌনবিষয়ে কিছু-না-কিছু

ভাবগত ও বস্তুগত উপজ্ঞা সংগ্রহ করিয়া থাকে। বহুক্ষেত্রেই তাহাদের অকালপরিপক্কতার অনিচ্ছাকৃত উত্তরসাধক হইয়া পড়েন অসতর্ক পিতামাতা ও জ্যেঠা-খুড়ার দল!

ছেলে-মেয়েরা নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের সহিত যখন স্বাধীনভাবে মেলামেশা করে, তখন যদি কেহ নিকটে থাকিয়া গুপ্তভাবে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, তাহাদের ঠাট্টা-ইয়ার্কির মধ্যে যে-সকল কথার প্রয়োগ হইতেছে, অথবা খেলাচ্ছলে মারামারি জড়াজড়ির মধ্যে যে-সকল কায়িক চেষ্টা সাধিত হইতেছে, সেগুলি যৌনভাবরসে বিস্ময়করভাবে অভিসিঞ্চিত। তাহাদের পিতামাতার পরস্পরের মধ্যে রজনীর রহস্যাচ্ছন্ন গোপনতায় লজ্জা ও আনন্দজনক একপ্রকার নিবিড় সংস্পর্শ ঘটিয়া থাকে—যাহারা ফলে তাহারা, তাহাদের ছোট ও বড় ভ্রাতাভগ্নীগণ পৃথিবীতে আসিয়াছে, এইরূপ একটা সহজসিদ্ধ জ্ঞান আজকাল বহু বালক-বালিকাই দশবৎসর বয়সের পূর্বে গঠন করিয়া লইতে পারে।

বালকবালিকারা যে আমাদের ধারণানুরূপ নিরীহ ও অজ্ঞান নহে, তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত Miss Mary Ware Dennett দিয়াছেন (*Marriage Hygiene*, Vol III, No. 1, p. 27)। ইহা জগতের প্রত্যেক মোটামুটি শিক্ষিত পরিবারের একটি সাধারণ প্রতিকৃতি বলিলেও চলে।...কোন বালক কেমন করিয়া তাহার জন্ম হইল তৎসম্বন্ধে কয়েক-বার সকৌতুক প্রশ্ন করিয়া, একদিন মাতার নিকট হইতে উত্তর পাইল, 'ছোট পুতুলটির মতো গ'ড়ে ভগবান তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, বাবা।' তারপর অবোধ বালক প্রশ্ন করিল, 'তোমার জন্ম কি ক'রে হ'ল মা? তোমাকেও কি ভগবান পৃথিবীতে আমার মতো

পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?' মাতা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ বাপ্।' আবার ছেলের জেরা চলিল, 'আচ্ছা, ঠাকুমা, ঠাকুমার মা, তাঁর মা, তাঁর মা—এঁরা সবাই কি ভগবানের হাতে তৈরি হ'য়ে এখানে এসেছিলেন?' মা ঢোক্ গিলিয়া বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ মাণিক, ভগবান ছাড়া আর কে আমাদের সৃষ্টি করবে?' তখন সেই দুধের গোপাল যে সঙ্গীন্ প্রশ্ন করিল, তাহাতে পল্লীগ্রামের হাড়-পাকা ফৌজদারী মাম্লার সাক্ষীও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। "Do you mean to say, mother, that there have been no sex relations in this family for over two hundred years?"...অতঃপর মাতা কি প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

জ্ঞান-লাভের সনাতন পন্থা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বালকবালিকাদিগের যৌনবিষয়ক কৌতূহল নিবৃত্তির আর একটি পারিবারিক কার্যকারক ছিল—দাদা-মহাশয়, ঠাকুরদাদা, দিদিমা ও ঠাকুরমা। রঙ্গচ্ছলে স্ত্রীপুরুষের কামচর্যা সম্বন্ধে তাঁহারা সীমাবদ্ধভাবে জ্ঞান বিতরণ করিতেন, কিছু উপদেশও দিতেন। তদুপরি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় সমবয়সী সদ্যবিবাহিত বন্ধুর নিকট হইতেও কিছু তত্ত্ব লাভ করা যাইত। ইহা ছাড়া পল্লীগ্রামে গরীব গৃহস্থ-ঘরে আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া-প্রতিবেশীদের শয়ন-কক্ষে উঁকি মারিয়া, এবং নবদম্পতির চাঁচ্, টিন্ বা ছিটে-বেড়ার ঘরের পাশে রাত্রিকালে আড়ি পাতিয়া, সুচতুর কুমার-কুমারীগণ আদিরস সম্বন্ধে কিছু প্রামাণিক ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিত। ইহা অত্যন্ত স্থূলভাবের শিক্ষাপ্রণালী; উহাতে অসময়ে যৌনবোধ জাগৃতির পথ সরল সহজ করিয়া দিত সন্দেহ

নাই। সর্বোপরি যৌনজ্ঞানের উহাই শেষ সীমা নহে এবং উহাতে নৈতিক শিক্ষার কিছু সাহায্য হইত না। বরং নিতান্ত শ্রদ্ধার পাত্রপাত্রীদের পশুসুলভ আচরণ দেখিয়া তরুণ মনে একটা জুগুপ্সা ও ঘৃণা-ভাবের উদ্রেক হইত।

আদিম জাতিদের যৌনজ্ঞানে দীক্ষা

উপযুক্ত বয়সে স্ত্রী-পুরুষের যৌন আচরণ কিন্তু আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কখনই ঘৃণার ব্যাপার ছিল না, বরং বরণীয় ও শ্লাঘনীয় ছিল। এখনো পৃথিবীর অসভ্য, বর্বর জাতিদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরীকে বিবাহ-সংস্কারের প্রাক্কালে প্রেমের বস্তুতান্ত্রিক দিক্‌টি সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, এবং শিক্ষকের আসনে সর্বদা উপ-বেশন করে পিতামাতা, খুড়া-খুড়ী, গ্রামের মাতব্বর প্রভৃতি। প্রয়োজন হইলে, অভিভাবকগণ তাহাদের দৃষ্টির নিম্নে নিজেরা সহবাস করিয়া, উহার প্রত্যেকটি কলাকৌশল ও ক্রিয়াতত্ত্বের সহিত পরিচয় ঘটাইয়া দিতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। তৎসহিত কোন্ সময়, কি অবস্থায়, কাহার সহিত যৌন-সম্মিলন ধর্মসম্মত, সুখকর বা বিপজ্জনক, সে বিষয়ে একটা শুচিতা-সম্মত ধারণা বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকন্যাদের মনে গাঁথিয়া দেওয়া হয়। আর একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আদিম জাতিদের নিকট বেশ্যাবৃত্তি, স্বযৌনিমৈথুন ও হস্তমৈথুন এখনো অজ্ঞাত।

বিবাহের পূর্বে কঠোর সংযম পালনের নিয়ম পারসীক ও হিন্দুধর্মে যেমন আছে, অসভ্য জাতিদের মধ্যেও সেইরূপ প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। স্ত্রীপুরুষের যৌন সম্মিলন-কার্যে প্রথম দীক্ষালাভের পূর্বে উভয়কেই কয়েক মাস বা সপ্তাহ ধরিয়া নানারূপ কষ্টসাধ্য পরিশ্রম ও যন্ত্রণাদায়ক

প্রক্রিয়ার অধীন থাকিতে হয়; তারপর কিছুদিন ধরিয়া অগ্নিগর্ভ শিক্ষা দেওয়া ও ব্রতীর নিকট হইতে মুখে-মুখে তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়।

—অস্‌ট্রেলিয়ায়

অস্‌ট্রেলিয়ার অন্তর্গত ভিক্‌টোরিয়া নামক প্রদেশের অধিবাসীদের যৌনধর্মে দীক্ষাদানের কতকগুলি আশ্চর্য প্রণালীর কথা আর, এইচ্‌. ম্যাথুস্‌ (*Zeitschrift fur Ethnolgie*, 1905, Heft 6) বিবৃত করিয়াছেন। বিবাহের সাত মাস পূর্বে গ্রামের মোড়লগণ সদ্য-প্রাপ্তবয়স্ক বালকদিগকে গ্রাম হইতে দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে লইয়া যায়। সেখানে তাহাদিগকে বন্যজন্তু শিকারের কৌশল শেখানো হয় ও একাকী নানাপ্রকার হিংস্র জন্তু বধ করিতে বলা হয়। কখনো তাহাদিগকে উপবাসে বা অর্ধাসনে রাখা, কখনো গুরুভার মোট বহিতে দেওয়া, কখনো বা ঈষৎ বিষ্ঠামূত্র পর্যন্ত গলাধঃকরণ করিতে আদেশ করা হয়। ব্রতীদিগকে জঙ্গলের ভিতরে বা বাহিরে দুই একটি অপরিচিত উপজাতির সংস্পর্শে আনিয়া, তাহাদের ভাষা, আইন-কানুন, আচার-ব্যবহার, উপকথা ও গানগুলি যথাসাধ্য আয়ত্ত করাইয়া দেশে ফিরাইয়া আনা হয়। তখন তাহারা নূতন মানুষ—নূতন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত। এইভাবে গ্রামের কয়েকটি ছেলে শিক্ষা-প্রাপ্ত হইলে, একটা সামাজিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়; সেইখানে বিবাহের পাত্রী ঠিক্‌ হইয়া যায়।

মধ্য-অস্‌ট্রেলিয়ার উত্তরভাগস্থ এক উপজাতি বিবাহ-দানের পূর্বে সন্তানের লিঙ্গমুণ্ডের চর্ম (অগ্রচ্ছদা) কাটিয়া ও মূত্রনালীর দ্বার ঈষৎ চিরিয়া দেয়। বালিকাদিগের ঋতু-শোণিত আবির্ভাব হওয়ামাত্র একটা

আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব সহকারে তাহাদের সতীচ্ছদ (hymen) কাটিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

—আফ্রিকায়

বৃটিশ-পূর্ব-আফ্রিকার মাসাই প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন বিবাহার্থী কিশোরের অগ্রচ্ছদা কাটিয়া দেওয়ার রীতি আছে, তেমনি কিশোরীর ভগাঙ্কুর (Clitoris) ও ভগাধর লঘু (Labia minora) ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। যদি কোন বালক বা বালিকা কর্তনকালে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠে, তাহা হইলে সে বিবাহের অযোগ্য বলিয়া নিন্দিত হয়। পঞ্চায়েতী বিচারে অনেক সময় ক্রন্দনের আসামী গোষ্ঠী হইতে বিতাড়িত হইয়াও থাকে।

আফ্রিকান্‌ বয়েণ্ডাদিগের দীক্ষাদান-ব্যাপার তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ক্রমে—গ্রাম্য পুরোহিত ও সর্দার উভয়ে মিলিয়া বালককে বংশানুক্রমিকভাবে প্রচলিত জাতীয় উপকথা ও ধর্মাচারগুলি সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তারপর শিক্ষা দেওয়া হয় যুদ্ধবিদ্যা, আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা ও উপবাস-কষ্ট; পরিশেষে বিবাহের দায়িত্ব ও লক্ষ্য সম্বন্ধে খুব সরল ও মোটামুটি কয়েকটা উপদেশ। ইহার পরই তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া বিবেচিত হয়। দ্বিতীয় ক্রমে—দিবাভাগে বালক ও বালিকার দল পরস্পর পৃথগ্‌ভাবে নৃত্যগীত শিক্ষা করে। তৃতীয় ক্রমে—রাত্রিকালে সমান সংখ্যক কিশোর-কিশোরী মদ্যপান করিয়া বাজনার তালে তালে উদ্দাম নৃত্য করিতে থাকে, এবং শেষযামে গুরু কর্তৃক প্রকৃত যৌনধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়। কিভাবে তাহাদিগকে হাতে-কলমে কামকেলিতে রসজ্ঞ হইতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা ঠারে-ঠোরে ব্যক্ত করিয়া, পাত্রী

গট্‌শ্লিং (The Bawenda, *Journal Anthropological Institution* p. 375) শেষে সকুণ্ঠায় বলিতেছেন, "The scene does not bear description."

মধ্য আফ্রিকার আজিম্বাল্যাণ্ড্ নামক ভূখণ্ডে কন্যাদিগকে কি করিয়া প্রেমবিদ্যায় দীক্ষা দেওয়া হয়, তাহা এইচ্, ক্রকোর্ড্ অ্যাঙ্গাস্ পরিষ্কার-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই দীক্ষা-উৎসবের নাম 'চেন্‌সামোআলী।' প্রথম ঋতুশোনিত দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই কন্যা তাহার মাতার সহিত গ্রামের বাহিরে মাঠের ধারে সদ্যনির্মিত একটি ক্ষুদ্র কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং যে কয়দিন ঋতুস্রাব থাকে, সেই কয়দিন তাহাকে সেই নির্জন কুঁড়েঘরের মধ্যে দিবারাত্র একাকী বাস করিতে হয়। অবশ্য বাটীর মেয়েরা সদা-সর্বদা তাহার তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যা করিয়া থাকে। কিন্তু কোন পুরুষেরই ঐ কুটিরের ত্রিসীমানায় উপস্থিত হইবার অধিকার নাই। চতুর্থ দিনে তাহাকে স্নান করাইয়া, একটা ধর্মসম্মত অনুষ্ঠানের সম্মুখীন করা হয়। পরিশেষে তাহাকে ঘেরিয়া গ্রামের সর্ববয়সের বিবাহিতা স্ত্রীলোকগণ নৃত্যগীত করিতে থাকে। গানের মধ্য দিয়া (অথবা গ্রামের সর্বাপেক্ষা বর্ষিয়সী মহিলা দ্বারা কথকতার ভঙ্গিমায়) আদ্যঋতুমতীকে ঋতুশোণিতের কারণ ও ক্রিয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে এবং স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সম্মিলন, গর্ভ-ধারণ, সন্তান-পালন, স্বামী-পরিচর্যা, সতীত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে অকপট জ্ঞান বিতরণ করা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়-বিবাহের উৎসব

আমাদের দেশে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আদ্যঋতুকালীন্ অনুরূপ একটা উৎসব ও দীক্ষাদান-প্রথা বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রচলিত ছিল।

এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিবিড় সংস্পর্শে আসায় ও কন্যাদের বিবাহ-বয়স ক্রমশ পিছাইয়া যাওয়ায়, এই প্রথাটির দ্রুত অবলোপ ঘটিতেছে। বাংলার বহু জেলায় প্রথম ঋতুস্রাব 'দ্বিতীয় বিয়ে' অথবা 'ফল দেখা' নামে পরিচিত ; এবং তৎসংশ্লিষ্ট উৎসবানুষ্ঠানটিকে 'কাদা' বলা হয়। কাদা নামের উৎপত্তির কারণ এই যে, চতুর্থ দিনে ঋতুস্নানের পূর্বে বাটী হইতে সর্ববয়সের পুরুষ লোকদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, উঠানে কয়েক কলস জল ঢালিয়া উহা কর্দমাক্ত করিয়া ফেলা হয়। ঐ কাদায় পাড়ার মেয়েরা দীক্ষার্থিনীকে লইয়া আনন্দে হুড়াহুড়ি, জড়াজড়ি, গড়াগড়ি করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে আদিরসাত্মক নানারূপ সঙ্গীত গাহিতে থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও বাংলার নানাস্থানে তথাকথিত 'কাদা' উৎসবের আমূল বিবরণ আমরা পরে কোথাও লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব।

কাদার সার্থকতা

বর্তমান নীতিনিষ্ঠার পরিমাপে এই দীক্ষাদান-প্রণালী ও আনুষঙ্গিক সঙ্গীতগুলি আপত্তিকর ও বর্বরোচিত মনে হইলেও উহার মধ্যে একটা কল্যাণকর অভিপ্রায় নিবদ্ধ ছিল। একটা আনন্দোজ্জ্বল উৎসবের লোক-ধর্মসঙ্গত আব্‌হাওয়ার মধ্যে মাতা, পিসী, মামী, খুড়ী, অথবা তৎস্থানীয়া প্রতিবেশিনীদিগের মুখ হইতে যৌন আচরণ ও স্বামীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ মনের উপর যে রেখাঙ্কন করিত, তাহা পরবর্তীকালে কোন বাহ্য প্রভাব অথবা বিপরীত শিক্ষার ফলে সহজে উঠিতে চাহিত না।

আমাদের বিশ্বাস যে, এই ধরণের একটা পারিবারিক পরিবেশে লব্ধ জ্ঞানের অভাবে আমাদের কন্যারা কৈশোরে পদার্পণ করিতে না

করিতেই বাহির হইতে সাগ্রহে বিকৃত যৌনবিদ্যা সংগ্রহ করিতেছে এবং সেই জ্ঞান বিবাহ-জীবনে প্রয়োগ করিতে গিয়া, নিজের ও স্বামীর মধ্যে ঘোর ব্যবধানের সৃষ্টি করিতেছে। কানের ঝুমকো ও ভাটিয়ালী গানের মতো এই দীক্ষাদানের অনুষ্ঠান একটু উন্নত, শ্লীলতা-ও-বিজ্ঞান-সম্মত রূপ পরিগ্রহ করিয়া আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে—মনে হয়। এবং তৎসহিত অবশ্য মেয়েদের বিবাহের বয়স বর্তমান অপেক্ষা পিছাইয়া আনিবার পন্থাও উদ্ভাবিত হইবে।

যৌনজ্ঞানে সাহিত্যের সহায়তা

সভ্য দেশের বর্ধনশীল বালকবালিকাগণ মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া যৌনবিদ্যায় স্বয়ংশিক্ষা লাভ করে পুস্তকের দ্বারা। কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ তরুণ-তরুণীর যৌনজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য বাহন। পূর্বেই বলিয়াছি, কাব্যোপন্যাসে প্রেমের স্বর্গ ও স্বপ্ন জড়াইয়া থাকে যতখানি, বাস্তবতার স্থান থাকে তদপেক্ষা অনেক কম। প্রেমের উচ্চ ও অনুপলভ্য আদর্শে সুকোমল মনগুলি হয় অভিষিক্ত। আবার অন্যদিকে সংবাদপত্রে, পাড়ায়, গ্রামে ও বন্ধুবান্ধবদের মুখে তাহারা প্রেমের কদর্য বাস্তবতার ঘটনা সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনে ও দেখে। কল্পনায় ও বাস্তবে চলে গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্ব। ফলে, কার্যকরী ও মঙ্গলদায়ক শিক্ষা তাহাদের কিছু হয় না। কেহ গড়িয়া উঠে ভাবুক-রূপে, কেহ নিন্দুক-রূপে। দাম্পত্য-জীবন তাহাদের প্রায় ক্ষেত্রেই আনিয়া দেয় শুধু নৈরাশ্য ও অসঙ্গতি।

সর্বদেশে প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ কাব্য, মহাকাব্য, নাটক ও ধর্মগ্রন্থের পৃষ্ঠায় পূর্ব-রাগজনিত ভাবোন্মাদ, প্রাকৃত প্রেম ও কামচর্যার সুরসাল

চিত্র অঙ্কিত থাকে প্রচুর। অথচ সেগুলিকে বর্তমান রাংতা-মোড়া সভ্যতা পরিবর্জন করিতে সাহসী হয় নাই; এবং তাহার কতকগুলি সর্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রপাঠ্য পুস্তকরূপে পরিগৃহীত। কুমার-সম্ভব, শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র, মৃচ্ছকটিক্, স্বপ্নবাসদত্তা, কাদম্বরী, গীত-গোবিন্দ, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল গ্রন্থাবলীর মধ্যে কান্তপ্রেমের অলকা-তিলকা আঁকা রহিয়াছে প্রাণস্পর্শীভাবে। উহা পাঠ করিয়া যৌব-মন কামনাচঞ্চল হইয়া উঠিতে পারে এবং উঠেও। গুরু-মুখে "সাহিত্য-দর্পণে"র সূত্র ও দৃষ্টান্তসমূহের টীকা-টিপ্পনী শুনিয়া বহু ছাত্রের মনে কাম-কণ্ডূতি প্রবল হইয়া উঠিত এবং যৌনাভিজ্ঞতা অর্জনের প্ররোচনা দিয়াছিল,—একথা সেই সকল পূর্বতন (অধুনা বৃদ্ধ) ছাত্রের কাহারো কাহারো মুখে বিশদভাবে শ্রবণ করিয়াছি।

প্যাণ্ডোরার বাক্স

লেখক যখন আটাশ বৎসর পূর্বে বোলপুর শান্তি-নিকেতনে ছাত্ররূপে কিছুকাল ছিলেন, সেই সময় তাঁহাদের শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথের একখণ্ড কাব্যগ্রন্থ বাংলা পাঠ্যরূপে অধীতব্য ছিল। সম্ভবত কবিগুরুর আদেশেই ক্লাসের বাংলা ভাষার অধ্যাপক একদিন আমাদের সদ্যক্রীত কাব্য-গ্রন্থগুলি চাহিয়া লইয়া, তন্মধ্যস্থ 'চিত্রাঙ্গদা' নামক খণ্ডকাব্য-সম্বলিত পৃষ্ঠাগুলির তিনটি পার্শ্ব কয়েক ফোঁড় সুতা দিয়া সেলাই করিয়া দিলেন—যাহাতে ছাত্রগণ উহার রসাস্বাদনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিতে না পারে। ক্লাসেও শিক্ষক মহাশয় নিষেধ করিয়া দিলেন যে, ঐ অংশটি পাঠ করিবার মতো বয়স তখনো আমরা প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং কোনক্রমে যেন উহার সেলাই খোলা না হয়।

করিতেই বাহির হইতে সাগ্রহে বিকৃত যৌনবিদ্যা সংগ্রহ করিতেছে এবং সেই জ্ঞান বিবাহ-জীবনে প্রয়োগ করিতে গিয়া, নিজের ও স্বামীর মধ্যে ঘোর ব্যবধানের সৃষ্টি করিতেছে। কানের ঝুমকো ও ভাটিয়ালী গানের মতো এই দীক্ষাদানের অনুষ্ঠান একটু উন্নত, শ্লীলতা-ও-বিজ্ঞান-সম্মত রূপ পরিগ্রহ করিয়া আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে—মনে হয়। এবং তৎসহিত অবশ্য মেয়েদের বিবাহের বয়স বর্তমান অপেক্ষা পিছাইয়া আনিবার পন্থাও উদ্ভাবিত হইবে।

যৌনজ্ঞানে সাহিত্যের সহায়তা

সভ্য দেশের বর্ধনশীল বালকবালিকাগণ মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া যৌনবিদ্যায় স্বয়ংশিক্ষা লাভ করে পুস্তকের দ্বারা। কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ তরুণ-তরুণীর যৌনজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য বাহন। পূর্বেই বলিয়াছি, কাব্যোপন্যাসে প্রেমের স্বর্গ ও স্বপ্ন জড়াইয়া থাকে যতখানি, বাস্তবতার স্থান থাকে তদপেক্ষা অনেক কম। প্রেমের উচ্চ ও অসুপলভ্য আদর্শে সুকোমল মনগুলি হয় অভিষিক্ত। আবার অন্যদিকে সংবাদপত্রে, পাড়ায়, গ্রামে ও বন্ধুবান্ধবদের মুখে তাহারা প্রেমের কদর্য বাস্তবতার ঘটনা সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনে ও দেখে। কল্পনায় ও বাস্তবে চলে গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্ব। ফলে, কার্যকরী ও মঙ্গলদায়ক শিক্ষা তাহাদের কিছু হয় না। কেহ গড়িয়া উঠে ভাবুক-রূপে, কেহ নিন্দুক-রূপে। দাম্পত্য-জীবন তাহাদের প্রায় ক্ষেত্রেই আনিয়া দেয় শুধু নৈরাশ্য ও অসঙ্গতি।

সর্বদেশে প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ কাব্য, মহাকাব্য, নাটক ও ধর্মগ্রন্থের পৃষ্ঠায় পূর্ব-রাগজনিত ভাবোন্মাদ, প্রাকৃত প্রেম ও কামচর্যার সুরসাল

চিত্র অঙ্কিত থাকে প্রচুর। অথচ সেগুলিকে বর্তমান রাংতা-মোড়া সভ্যতা পরিবর্জন করিতে সাহসী হয় নাই; এবং তাহার কতকগুলি সর্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রপাঠ্য পুস্তকরূপে পরিগৃহীত। কুমার-সম্ভব, শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র, মৃচ্ছকটিক্, স্বপ্নবাসবদত্তা, কাদম্বরী, গীত-গোবিন্দ, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল গ্রন্থাবলীর মধ্যে কান্তপ্রেমের অলকা-তিলকা আঁকা রহিয়াছে প্রাণস্পর্শীভাবে। উহা পাঠ করিয়া যৌব-মন কামনাচঞ্চল হইয়া উঠিতে পারে এবং উঠেও। গুরু-মুখে "সাহিত্য-দর্পণে"র সূত্র ও দৃষ্টান্তসমূহের টীকা-টিপ্পনী শুনিয়া বহু ছাত্রের মনে কাম-কণ্ডূতি প্রবল হইয়া উঠিত এবং যৌনাভিজ্ঞতা অর্জনের প্ররোচনা দিয়াছিল,—একথা সেই সকল পূর্বতন (অধুনা বৃদ্ধ) ছাত্রের কাহারো কাহারো মুখে বিশদভাবে শ্রবণ করিয়াছি।

প্যাণ্ডোরার বাক্স

লেখক যখন আটাশ বৎসর পূর্বে বোলপুর শান্তি-নিকেতনে ছাত্ররূপে কিছুকাল ছিলেন, সেই সময় তাঁহাদের শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথের একখণ্ড কাব্যগ্রন্থ বাংলা পাঠ্যরূপে অধীতব্য ছিল। সম্ভবত কবিগুরুর আদেশেই ক্লাসের বাংলা ভাষার অধ্যাপক একদিন আমাদের সদ্যক্রীত কাব্য-গ্রন্থগুলি চাহিয়া লইয়া, তন্মধ্যস্থ 'চিত্রাঙ্গদা' নামক খণ্ডকাব্য-সম্বলিত পৃষ্ঠাগুলির তিনটি পার্শ্ব কয়েক ফোঁড় সুতা দিয়া সেলাই করিয়া দিলেন—যাহাতে ছাত্রগণ উহার রসাস্বাদনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিতে না পারে। ক্লাসেও শিক্ষক মহাশয় নিষেধ করিয়া দিলেন যে, ঐ অংশটি পাঠ করিবার মতো বয়স তখনো আমরা প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং কোনক্রমে যেন উহার সেলাই খোলা না হয়।

বেশ স্মরণ আছে যে, সেইদিন সন্ধ্যাকালে ও পরদিন দ্বিপ্রহরে বহু ছাত্র গোপনে সেলাই কাটিয়া একনিঃশ্বাসে আগাগোড়া চিত্রাঙ্গদা পাঠ করিয়া ফেলিল; এবং কাব্যের পরিপূর্ণ রসাস্বাদন করিতে না পারিলেও কেন উহার পাঠ সম্বন্ধে এত সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিল। কয়েক মাস পরে আমাদের ক্লাসের এক ছাত্র কোন সমবয়স্কা বান্ধবীকে এক প্রেমপত্র লিখিয়া শয্যাতলে লুকাইয়া রাখিয়াছিল (হয়তো পাঠাইবার সুবিধা পায় নাই বা সাহস হয় নাই)। একদিন বৈকালে আমরা দুই বন্ধুতে তাহা চুরি করিয়া পাঠ করিয়া দেখি—পত্রের দুইটি জায়গায় চিত্রাঙ্গদার বারো-চৌদ্দটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

উপন্যাস, পুরাণ প্রভৃতির অংশ

'হরিদাসের গুপ্ত কথা', 'নানা' 'রাণী ইউজিনের বৈঠক,' 'লণ্ডন রহস্য', 'মানদার আত্মকথা,' 'রাতের কলিকাতা', 'প্রাচীর ও প্রান্তর', 'এরা, ওরা, আরও অনেকে', 'দুয়ে দুয়ে চার', 'কাজরী' প্রভৃতি ও বটতলার নানাবিধ উপন্যাস, বহু কিশোর-কিশোরীর মনে বিগত চারি পাদে যেমন প্রেমের কল্পলোকে বিচরণের সুবিধা করিয়া ও কামাবেগ-স্ফুরণের প্রথম প্রণোদন জাগাইয়া দিয়াছে, তেমনি বৌদ্ধ জাতক, অষ্টাদশ পুরাণ, কথাসরিৎ সাগর, মহাভারত যুগযুগান্ত ধরিয়া ধর্মশিক্ষার পাশে পাশে মানুষের যৌনবোধ ও দুর্নীতিপ্রবণ প্রবৃত্তিকে শাণিত করিবার প্রচুর উপাদান যোগাইয়া আসিয়াছে। দ্বৈপায়নের জন্ম-বৃত্তান্ত, পাণ্ডুর মৃত্যুরহস্য, কুন্তীর কুমারী অবস্থায় গর্ভধারণ, পঞ্চ পাণ্ডবের দ্রৌপদীকে বিবাহ ও ভ্রাতৃ-উপভোগে বাধা-প্রদানকারী

অর্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের বনবাসের আদেশ, অর্জুনের সুভদ্রা-হরণ, হিড়িম্বার সহিত ভীমসেনের বিহার-বর্ণনা, প্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপেরকারণ প্রভৃতি ঘটনার উপর ক্ষমাসুন্দর পবিত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করা তরলমতির পক্ষে কতখানি সহজসাধ্য, তাহা ভাবিবার বিষয়।

বাইবেল—প্রেমাত্মক পাঠ্যপুস্তক

এলিসের "Psychology of Sex" (Vol. VI, p. 90) হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইয়োরোপের এত বেশি সংখ্যক নরনারী বাল্যকালে 'ওল্ড্ টেস্‌টেমেণ্ট্' পাঠ করিয়া যৌনবিষয়ক পরিজ্ঞান লাভ করে যে, বাইবেল্‌কে এক্‌খানা প্রেমাত্মক পাঠ্যপুস্তক বলিয়া অভিহিত করা চলে। বুক্ অব্ মোজেস্, অ্যামনন ও তামার, লট্ ও তাঁহার কন্যাগণ, জোসেফ্ ও পটিফার-জায়ার কাহিনী প্রভৃতি কচি মনে গোপন অনুধ্যান ও কৌতূহল জাগাইয়াছে এবং যৌন-সম্বন্ধ বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য যোগাইয়াছে।

এলিসের কোন সংবাদদাতার নিকট তাঁহার একজন বন্ধু ও বান্ধবী কবুল করিয়াছেন যে, উভয়ের বয়স যখন কিছু কম-বেশী পনের বৎসর, তখন তাঁহারা প্রতি রবিবার প্রাতে গীর্জায় বসিয়া একান্তে নিজ নিজ বাইবেলের মধ্য হইতে প্রণয়সূচক পংক্তিগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতেন, এবং সেইগুলি অঙ্গুলির দ্বারা চিহ্নিত করিয়া পরস্পরের বাইবেল্ পরস্পরের নিকট চালাচালি করিতেন।

বাইবেল সম্বন্ধে হাভ্‌লক্ এলিস্ কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। এগুলি আমাদের পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধেও প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য। "The Bible is not in every respect a model introduction

for the young mind to the questions of sex. But even its frank acceptance, as of divine origin, of sexual rules so unlike those that are normally our own, such as polygamy and concubinage, helps to enlarge the vision of the youthful mind by showing that the rules surrounding the child are not those everywhere and always valid, while the nakedness and realism of the Bible cannot but be a wholesome and tonic corrective to conventional pruderies."

এমনিভাবে সেক্সপীয়ারের *Venus & Adonis, Antony and Cleopatra* অথবা *Rape of Lucrece* এবং বায়রণের *Don Juan* অথবা *Bride of Abydos* পড়িয়া অনেক তরুণ-তরুণীর মনে মদন-পীড়ন উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে—প্রেমের বস্তুগত পরিণতির ছবি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

অনভিপ্রেত, অজস্র শিক্ষার প্রণালী

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, লোকসাহিত্য, সমসাময়িক কাব্যোপন্যাস প্রভৃতির সহায়তায়—চলচ্চিত্র, নাট্যাভিনয় ও নারীনৃত্যের সহায়তায়—দাসদাসী, গৃহশিক্ষক, দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সহায়তায়—শহরের রাস্তাঘাটে পরিদৃশ্যমান বিলাসবিভ্রমময়ী গণিকাদল, কুকুর-বিড়াল-ষণ্ডাদির সঙ্গম-ব্যাপারের সহায়তায়—তরুণ মনের যৌনবিষয়ক শিক্ষা অশ্রান্তভাবে চলিতেছে। শিক্ষার বাহন ও ধরণগুলি যত অনভিপ্রেতই হোক্ না না কেন, কোনপ্রকার বিপর্যয়কর বিধি-বিধানের দ্বারা উহার গতিরোধ

করা সম্ভব নহে। এইরূপ শিক্ষা একদিকে যেমন অল্পবয়স্কের প্রাণে স্মরদেবতার অকালবোধন করে, অন্যদিকে তেমনি বহু প্রাপ্তবয়স্কের নৈতিক ভিত্তি শিথিল করিবার সম্ভাবনা প্রগাঢ় করে।

পরিচ্ছদ-অলঙ্কারাদিজনিত বিলাসের ন্যায় যৌন স্বেচ্ছাচারের চিত্র ও বৃত্তান্ত ভাবাবেগপ্রবণ ব্যক্তির প্রাণে নির্বিচারে পরানুকরণবৃত্তি জাগাইয়া তুলে। তাহাতে ব্যক্তির বিপদ, পরিবারের বিপদ, সমাজের বিপদ ঘনীভূত হয়। অজ্ঞানের ন্যায় মিথ্যাজ্ঞানও সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারে। সেইজন্য নিছক্ যৌন-বিজ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজনীয়। সর্বত্র সত্যকার সমাজ-হিতৈষীবৃন্দ এক্ষণে ইহারই আলোচনা ও প্রচারের মধ্যে নব-জাগ্রত জাতির মুক্তির মহিমালোক প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

বিদ্যালয়ে যৌন-বিজ্ঞান শিক্ষা

ইংলণ্ড, আমেরিকা যুক্তরাজ্য, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, জার্মানী ও চেকোস্লোভাকিয়ার কোনো কোনো স্থলে উচ্চ স্কুলের শেষ ক্লাস দুইটীতে ও কলেজে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাথমিক জীববিজ্ঞান শিক্ষার সহিত যৌন-স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান-দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবশ্য বহুস্থলেই এই বিষয়ে শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে আবশ্যিক করা হয় নাই ও তৎসম্বন্ধে কোন পরীক্ষা গ্রহণ করাও হয় না। হার্ভার্ডের উইলিয়াম্‌স্ কলেজে John Hopkins ও Clark ছাত্রদের নিকট সর্বপ্রথম সীমাবদ্ধভাবে যৌন বিষয়ক কয়েকটি বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া যান। সে প্রথা এখনো প্রচলিত আছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রুসিয়ার ব্রেস্‌লাউ শহরে কেন্দ্রীয় স্কুল

পক্ষ ডাঃ মার্টিন্ কেৎসেন্‌কে একপ্রস্থ যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত করেন; তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দ ছিলেন ট্রেনিং কলেজের দেড় শত যুবক শিক্ষক। ডাঃ এ, হাইডেনহাইন্ এই জাতীয় কতকগুলি বক্তৃতা একত্র করিয়া একখানি ছোট সচিত্র পুস্তক (*Sexuelle Belehrung der aus den Volksschule entlassenen Madchen*, 1907) সঙ্কলন করিয়াছিলেন। সে সকল বালিকা স্কুলের শেষ শ্রেণীর পরীক্ষা দিত, স্কুল পরিত্যাগ করিবার সময় তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে ঐ পুস্তিকা একখণ্ড করিয়া বিতরণ করা হইত।

সহজ-পাঠ্য যৌন-বিজ্ঞানের পুস্তকাবলী

ইহা ব্যতীত বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের যৌন বিষয়ক গৃহপাঠ্য কত পুস্তক যে ইয়োরোপ-আমেরিকার দেশগুলিতে এতাবৎকাল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এম্, এ, ওয়ারেন্ নামক একজন আমেরিকান্ স্কুল-শিক্ষক *Almost Fourteen* নামক একখানি সুন্দর শিক্ষাপূর্ণ পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তারপর মেরী টিউডর পোলের *The Wonder of Life*, মার্গারেট্ মলির *Song of Life*, এলিস্ এথেল্‌মারের *Baby Buds* ও *Human Flower*, স্ট্যান্‌লি হলের *Adolescence* ইত্যাদি হাজার হাজার পুস্তক যৌন-বিজ্ঞানের অরুণালোকে তরুণ মানস উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিদ্যালয়ে যৌনবিষয়ক জ্ঞানদান তো বহুদূরের কথা, গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষায় একখানিও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষোপযোগী পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।

বাংলাদেশে গ্রন্থদৈন্য

তারপর, প্রাপ্তবয়স্ক, বিবাহিত নর-নারীদের যৌনবিষয়ক সুশিক্ষাদান ও ভ্রান্ত ধারণাসমূহ নিরসনের শুভ উদ্দেশ্য লইয়া বাংলা ভাষায় শোচনীয়ভাবে অপর্যাপ্ত যে গ্রন্থগুলি এপর্যন্ত বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে নাম করিবার মতো দুই-চারিখানি ব্যতীত বাকিগুলি সমস্তই, গ্রন্থকারগণের পরিমিত বিদ্যা, অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিষয়-উদ্ভাসনের অক্ষমতা প্রকটিত করিয়া দিয়াছে। কয়েকখানি তো মানুষের হীনবৃত্তির খোরাক্ যোগাইয়া অর্থোপার্জনের সুস্পষ্ট অভিপ্রায় লইয়াই বাজারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

দুঃখের বিষয়,—কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলাদেশ ভারতে পুরোধার আসন অধিকার করিয়া, কেবল উদাসীনতা ও নৈতিক সাহসের অভাবে জীবনের এত বড় একটা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনা ও গবেষণাকে এতদিন পশ্চাদ্ভূমে সরাইয়া রাখিয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বেকার "কামসূত্র" লইয়া আমরা গর্ব করি বটে; কিন্তু হ্যাভ্‌লক এলিসের "Psychology of Sex", ডাঃ নর্ম্যান্ হেয়ারের "Sexual Encyclopedia," ক্র্যাফ্‌ট্ এবিংয়ের "Psychopathia Sexualis," ডাঃ ম্যালচাউ-এর "The Sexual Life" প্রভৃতির ন্যায় একখানিও আধুনিক কালের পুস্তক বাংলা ভাষায় নাই দেখিয়া মরমে মরিয়া যাই।

যৌন বিশ্বকোষের পরিকল্পনা

বাংলা ভাষার ও বিজ্ঞান-সাহিত্যের এই বিশিষ্ট অভাব দূর করিবার—প্রেম, কাম ও যৌনবিষয়ক পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানরাশি একপাত্রে সংগ্রহ

করিবার ইচ্ছাই আমাদের মনে "যৌন বিশ্বকোষ" রচনার উদ্যম জাগাইয়াছে। ইহাতে জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া নরদেহের সংস্থানতত্ত্ব ও ক্রিয়াতত্ত্ব, অন্তঃরসতত্ত্ব, মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীর যৌন-বোধ, যৌন-আবেগ ও যৌনজীবন, নৈতিক মতবাদের বিবর্তন, বিভিন্ন দেশের বিবাহ-তত্ত্ব, ব্যাভিচার ও গণিকাবৃত্তির ইতিহাস, মানুষের কর্মজীবনে যৌনভাবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব, বিভিন্ন গাথা-গল্পে, সাহিত্যে, শিল্পে ও ভাস্কর্যে যৌনলিপ্সার বিজৃম্ভন, লিঙ্গ ও যোনিপূজার ইতিবৃত্ত, চিরকুমারী ও অকৃতদারের গূঢ়তম জীবন-কথা, দাম্পত্য-জীবনের বিবিধ ধারা—তাহাদের বিচার-বিশ্লেষণ ও উদাহরণ, ফ্রয়েড্ ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মতবাদের চুম্বক, কামসূত্র, অনঙ্গরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার, সর্বস্তরের বাঙালী নর-নারীর শিক্ষাপ্রদ বিচিত্র আত্মকাহিনী, যৌনজীবনে নানারূপ অস্বাভাবিক ও কদর্য অভ্যাসের বৃত্তান্ত ও সত্যকার দৃষ্টান্ত, রতিজ ব্যাধিসমূহ, নানারূপ বিকারের মনোবিকলন, নিদান-নির্ণয়, প্রতিকারের উপায়, সর্বকালে আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত মন্ত্রতন্ত্র, শিকড়, মাদুলি, দেশী ও বিদেশী প্রতিষেধক ও আরোগ্যকর নানারূপ ঔষধ, বৃষ্য ও রসায়নের নাম ও প্রস্তুত-প্রণালী প্রভৃতি বহু বিষয় এই বিরাট গ্রন্থখানিতে চিত্র-সহযোগে ক্রমশ আলোচিত হইবে। প্রণয়ন-সূত্রে বিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলির যেমন সাহায্য লওয়া হইতেছে, সেইরূপ প্রতিপদে এ দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ গ্রহণ অথবা মাঝে মাঝে তাঁহাদের রচনাবলী প্রকাশ করা হইবে।

প্রথম পটল

জীব-জীবনের বিবর্তন

কাম ও প্রেমের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটা পারম্পরিক জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে জীব-জীবনের ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা আবশ্যক। পৃথিবীতে প্রথম জীবনের সৃষ্টি কবে হইল, তাহার সঠিক হিসাব দেওয়া বড় কঠিন কার্য; কারণ পৃথিবীর বয়স কত কোটি বৎসর তাহা লইয়া এখনো বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। যাহা হউক, বিভিন্ন মতের যথাসাধ্য সামঞ্জস্য করিয়া বলা যায় যে, কমবেশি ছয় কোটি বৎসর পূর্ব হইতে জীব-জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু মানুষ জন্মিয়াছে, তাহার অনেক পরে—মাত্র প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্বে।

সকলেই জানেন, সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় সমস্ত পৃথিবী উষ্ণ, অচ্ছোদ, ঘনায়মান বাষ্পময় (Nebular) ছিল। পরে উহার কেন্দ্রভাগ কর্দমপূর্ণ ও উপরিভাগের আগাগোড়া জলময় হইয়া যায়। সর্বশেষে জলের মধ্য হইতে পর্বত-প্রান্তরভূষিত স্থলভাগের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং সর্বপ্রথম প্রাণীর উদ্ভব হয় বায়ুতে কিম্বা জলে। জড়-জগতে যেমন ক্ষুদ্রতম একটি অণু অথবা প্রোটন্-ইলেক্ট্রন্ হইতে সৃষ্টির হাতেখড়ি, প্রাণী-জগতে সেইরূপ বীজাণু (Bacteria) ও প্রজীব (Protozoa) হইতে সৃষ্টির দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা।

বীজাণু

বীজাণু ও জীবাণুর নাম আমরা বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিভিন্ন রোগের নিদানতত্ত্ব অধ্যয়ন-সূত্রে বহুবার শুনিতে পাইয়াছি। কিন্তু শুধু বিভিন্ন রোগ-সৃষ্টির মূলে ইহাদিগকে বসাইয়া রাখিলে চলিবে না, নিখিল উদ্ভিদ-ও-জীব-জীবনের আদিম পুরুষ হিসাবে ইহার প্রতি সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে আমাদিগকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বীজাণু এত ক্ষুদ্র যে, ইহাদিগের হাজার-হাজারটিকে একত্র করিয়া একটি আল্‌পিনের অগ্রভাগে স্বচ্ছন্দে ধরিয়া রাখা যায়। এক ইঞ্চি পরিমিত একটি অতি সূক্ষ্ম রেখাকে পঁয়ত্রিশ হাজার অংশে ভাগ করিয়া উহার এক ভাগ যদি কল্পনা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে কোনো কোনো জাতীয় জীবাণুর দেহের আয়তন সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা সহজসাধ্য হয়। সুতরাং ইহারা প্রত্যেকে আমাদের চক্ষুর অগ্রাহ্য,—উহাদিগের সাক্ষাৎ পাইতে হইলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (Microscope) সাহায্য লইতে হয়। ইহাদের প্রাণ-শক্তি আছে, গতি নাই। ইহাদের জীবন উদ্ভিদ ও প্রাণীতত্ত্বের মাঝামাঝি একটা অর্দ্ধোস্ফুট অবস্থা।

এত সূক্ষ্মশরীরত্বের মধ্যেও বীজাণুদের ক্ষুধাতৃষ্ণা-বোধ আছে, অল্পমাত্রায় অনুভূতি-শক্তি আছে, বাঁচিবার ও বাড়িবার একটা অন্ধ সংস্কার আছে। ইহারা এককোষাণুযুক্ত (unicellular) জীব বিশেষ। কোষাণু (cell) কাহাকে বলে, তাহা পরে বলিতেছি। এককোষাণু জীবদের বংশ-বিস্তারের ধারা হইল,—প্রত্যেকে কিছুক্ষণ যথোচিত বৃদ্ধি পাইয়া পরে নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটি পৃথক সত্তায় পরিণত করে। এক শ্রেণীর বীজাণু হইতেই প্রতানাণু

(Protists) ও নানাপ্রকার আদিম জলজ শৈবালের উৎপত্তি হইয়াছিল। জল, বায়ু ও বিগলিত লবণ হইতে ইহারা আত্মপোষণের উপাদান সংগ্রহ করে।

আদিম জলজ শৈবাল

অণুদেহী আদিম জলজ শৈবাল নিজ গাত্রে ক্লোরোফিল্ বা তদনুরূপ একটা হরিত রঞ্জকপদার্থের সৃষ্টি করিতে পারিত। বৃহত্তর উদ্ভিদসমূহের পত্রে ক্লোরোফিল্ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। সূর্যালোক-শক্তি দ্বারা কার্বন্-ডাইঅক্সাইড্ বাষ্পকে নানাভাবে ভাঙিয়া-চুরিয়া বৃক্ষের পুষ্টি-কার্যে লাগাইতে সাহায্য করে—ওই ক্লোরোফিল্। একজাতীয় আণবিক্ শৈবাল কালক্রমে নিজ নিজ দেহ হইতে একপ্রকার সূক্ষ্ম পুচ্ছ বিশেষ বিকশিত করিয়াছিল। ভিতর হইতে একটা ধাক্কা দিয়া ঐ পুচ্ছ-সাহায্যে তাহারা জলের মধ্যে কোনমতে চলা-ফেরা করিতে পারিত,—জলের স্রোত তাহাদের এই তথাকথিত গতির কতকটা আনুকূল্য বা প্রতিকূলতা করিত।

এই জাতীয় শৈবালের বংশধারা এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। বর্ষাকালে বৃক্ষত্বক্ ও প্রস্তর বা সিমেণ্ট-করা মেঝের গায়ে একপ্রকার ঘোর সবুজ বর্ণের পাৎলা আস্তরণ পড়ে। উহারা ছয় কোটি বৎসরের অধিক কাল পৃথিবীতে আপনাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

কোষাণুর পরিচয়

এক্ষণে কোষাণু কাহাকে বলে, তাহা অল্প কয়েকটি কথায় বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করি। আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের গোড়াকার কথাই হইল

কোষাণু সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান। পৃথিবীর প্রত্যেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রাণীর একটি অখণ্ডনীয় অংশ (unit) হইল একটি কোষাণু। বলা বাহুল্য, একটি, দুইটি, নব্বই, একশত, এক লক্ষ, এক কোটি, দশ কোটি বা তদধিক সংখ্যক নানাজাতীয় কোষাণুর সমবায়ে বিভিন্ন জীবদেহের সৃষ্টি হয়। এক-একটি কোষাণু প্রাণী-শরীরের এক-একটি ক্ষুদ্রতম সংসার বিশেষ; ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের ক্ষুধাতৃষ্ণার সংস্কার আছে, হ্রাসবৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। জীবদেহের বৃদ্ধি অর্থেই কোষাণুদের পুষ্টি ও সংখ্যার পরিবৃদ্ধি বুঝিতে হয়।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানদেশীয় দুই বন্ধু—শ্লাইডেন্ ও শ্‌ভান একত্র মিলিয়া কোষাণু আবিষ্কার করেন। কোষাণুর বাহ্য আকৃতি দেখিয়াই তাঁহারা খুশি হইয়াছিলেন, অত ক্ষুদ্র পদার্থের মধ্যে কি আছে বা না আছে, তাহার তত্ত্ব-নির্ধারণের তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। কোষাণুদের তাঁহারা দেখিলেন সূক্ষ্ম চাদরে-মোড়া প্রায় গোলাকার ঈষৎ চ্যাপ্টা ছোট থলি বা ঘর, অথবা কতকটা মধু-চক্রের মধুকোষের মতো। মধুকোষের ন্যায় কোষাণুর মধ্যেও যে একপ্রকার অর্ধ কঠিন অর্ধতরল পদার্থ আছে, তাহা পরে নির্ণীত হয়।

ওই আঠালু পদার্থের ইংরাজী নাম 'প্রোটোপ্লাজ্‌ম্' (Protoplasm); বাংলায় 'মৌলধাতু' বলা উচিত। আবার মৌলধাতুর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটি ঘনতর পদার্থের সূক্ষ্ম বিন্দু দেখা যায়। উহাকে বলা হয় কোষাণুর 'প্রাণবিন্দু' (Nucleus). বলা বাহুল্য, প্রত্যেক কোষাণুকেন্দ্রস্থ প্রাণবিন্দুই তাহার জীবনী-শক্তি ও আত্মবিস্তার-শক্তির আধার। কোষাণু আবার নানা আকার-প্রকারের আছে। প্রত্যেক প্রাণীদেহের বাহ্যাভ্যন্তর বিভিন্ন জাতীয় কোষাণুপুঞ্জের

সমন্বয়ে গঠিত,—তাহার পেশী, তাহার অস্থি, তাহার গ্রন্থি, তাহার হৃৎপিণ্ড, তাহার চুল, তাহার নখ, সমস্তই।

প্রজীব

বীজাণু, প্রতানাণু প্রভৃতিই সত্যকার উদ্ভিদ-বংশের জন্মদাতা। উহারাই কিছুকাল পরে আর একটি নূতন বংশধারার সৃষ্টি করিয়াছিল; তাহাদের নাম প্রজীব (Protozoa) অর্থাৎ নিখিল প্রাণীর আদিপুরুষ। তখন সমুদ্রের তলদেশ গুটাইয়া ও গুকাইয়া একটু একটু করিয়া তীরভূমি জাগিয়া উঠিয়াছে,—নিস্তব্ধ গিরিচূড়ে নিত্য প্রভাত-সূর্যের আলোকরশ্মি আসিয়া একাকী খেলা করিয়া যায়। প্রজীবগুলিও অণুদেহী ও এককোষাণুবিশিষ্ট।

অণোরণীয়ান্ প্রজীবগণ জীবসৃষ্টির প্রথম অবস্থায় নিজের এক কোষাণুমধ্যস্থ জড় ও জৈব প্রকৃতির ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া, জলে, স্থলে, বায়ুতে আরো কয়েক প্রকার এক-কোষাণুবিশিষ্ট প্রাণীর উদ্ভাবন করিয়াছিল। তন্মধ্যে ইনফিউসোরিয়ান্, নক্টিলিউকা (রাত্রে সমুদ্র জলে ঝক্‌মক্ করিয়া জলে), ট্রাইপ্যানোসোম্ (যাহারা মারাত্মক সুষুপ্তি-ব্যাধি আনয়ন করে), স্পোরোজোয়া (ম্যালেরিয়া জীবাণু ইহাদের অন্যতম), গ্রিগেরাইন, রাইজোপড্‌স প্রভৃতি শ্রেণীগুলি উল্লেখযোগ্য।

অম্বাণু

শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত একপ্রকার আদিম প্রাণী আছে, তাহার নাম 'অম্বাণু' (Amœba)। অম্বাণুদের একপ্রকার গতিশক্তি

আছে, আকৃতি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। একপদ অগ্রসর হইতে হইলে ইহারা গুগ্‌লির শুঁড়ের মতো নিজ দেহ হইতে আস্তরণঘেরা মৌলধাতুর খানিকটা সরু করিয়া বাড়াইয়া দেয়, তারপর ধীরে ধীরে ঐ প্রবর্ধিত সরু অংশের অগ্রভাগে প্রাণবিন্দু-সমেত কোমল মৌলধাতুর অবশিষ্ট ভাগটুকুকে গড়াইয়া দেয়। অম্বাণু অন্য ক্ষুদ্রতর জীবকে অথবা অন্য অম্বাণুকে আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, তাহাকে বেড়ীর মতো আকারে নিজ দেহ হইতে দুইটি বাহু প্রলম্বিত করিয়া জড়াইয়া ধরে ও নিজের মৌলধাতুর মধ্যে টানিয়া লইয়া হজম করিয়া ফেলে। অম্বাণুরা সাধারণত জলাশয়ে, নালা-নর্দামায়, আর্দ্র জমিতে ও প্রাণীর উদর-দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। অম্বাণু নানা প্রকারের আছে; একপ্রকার আমাশা-রোগের জন্মদাতা হইল এই অম্বাণু শ্রেণীর ক্ষুদ্র জীবাণুকুল।

বহুকোষাণুযুক্ত জীব

এককোষাণুদেহী জীব হইতেই ক্রমশ বহু-কোষাণুযুক্ত জীবের উদ্ভব হইয়াছে। কেমন করিয়া—কি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে হইল, তাহার ব্যাখ্যা জীববিজ্ঞান দিলেও আপাতত এস্থলে উল্লেখ করার প্রয়োজন হইবে না। বহুকোষাণুযুক্ত প্রাণীর একটা বৈশিষ্ট্য আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, তাহাদেরও জীবনের সূত্রপাত একটি কোষ হইতে। তারপর ঐ একটি কোষ বহুকোষে বিভক্ত হয় এবং নানা আকৃতি-প্রকৃতির কোষাণুপুঞ্জের সৃষ্টি করিতে থাকে। একটি ক্ষুদ্রতম কীট হইতে একটি অতিকায় হস্তীর উদ্ভব হইয়া থাকে একটিমাত্র কোষাণুর পত্তন হইতে। এই প্রথম কোষাণুটি কিভাবে কোন্ সূত্রে গঠিত হয়,

তাহার উত্তর হইল যৌনবিজ্ঞানের একটা প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, ও উহা একটু বিশদভাবে বিবৃত করিতে হইবে; তাহা আমরা পরের অধ্যায়ে করিব।

বিবর্তনবাদে মত-বৈষম্য

আপাতত বিবর্তনবাদ (theory of Evolution) সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ ও অন্যান্য গ্রহ ঘুরিতেছে—এ সত্যকে যেমন অস্বীকার করার উপায় নাই, পৃথিবীস্থ উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎও যে ক্রম-পরিণতির নিয়মসূত্র মানিয়া চলিয়াছে—এ তথ্যকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার স্পর্ধা আজ কাহারো নাই।

অভিব্যক্তি-ব্যাপার সম্বন্ধে পণ্ডিত ও অপণ্ডিত-সমাজ একমত হইলেও উহার কর্মধারা সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন্। সকলেই স্বীকার করেন যে, উদ্ভিদ হইতে জঙ্গম জীবের—এক হইতে বহুর—এককোষাণু জীব হইতে বহুকোষাণু জীবের—ক্ষুদ্র প্রাণী হইতে বৃহৎ প্রাণীর—আকৃতি-প্রকৃতিগত সাম্য হইতে বিচিত্র বৈষম্যের একটু একটু করিয়া বিকাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু কেমন করিয়া এই বহুমুখী জৈবিক পরিবর্তন সংঘটিত হইল, তৎসম্বন্ধে মূলত চারিপ্রকারের স্বতন্ত্র মত-বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মতবাদ চতুষ্টয় আবার স্থূলত দুইভাগে বিভক্ত; একটির নাম দেওয়া যায় 'জড়যন্ত্রবাদ' (Mechanistic), অন্যটির 'প্রাণতন্ত্রবাদ' (Vitalistic)।

জড়বাদী ও প্রাণবাদী

জড়যন্ত্রবাদীরা বলেন,—জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি; জীবন-স্রোতে জোয়ার-ভাঁটা ও বহুমুখীনতা সম্ভব হইয়াছে জড়তত্ত্ব ও রসতত্ত্বের (Physics & Chemistryর) বিভিন্ন আইন-কানুনের কার্যকারিতায়। প্রাণতন্ত্র-বাদীরা বলিতেছেন,—প্রাণ ছাড়া প্রাণের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। জীবসৃষ্টির প্রাক্কালে যেভাবেই হোক্ একটা বিরাট্ প্রাণশক্তির ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ উড়িয়া আসিয়াছিল। জৈবিক অভিব্যক্তির প্রারম্ভে উহাই ছিল প্রত্যক্ষ মূলধন। পূর্বকল্পিত একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা-কল্পেই হোক্ অথবা আদ্যশক্তির অনির্দেশ্য অন্ধ সৃজনাবেগ-বশেই হোক্, জীবনের এই অনন্ত রূপান্তর-গ্রহণ-লীলা চলিতেছে।

যাহা হউক, জড়বাদী-গোষ্ঠীর দুইটি ঈষৎ-ভিন্ন মতের প্রতিষ্ঠাতা দুই-জন জ্ঞানগুরুর নাম এস্থলে উল্লেখ করিতে ও তাঁহাদের মতবাদের সহিত সাধারণ পাঠকের যৎসামান্য পরিচয় ঘটাইয়া দিতে হইবে। একজন হইলেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক—নাম তাঁহার জঁা লামার্ক্ (Jean Lamarck); তাহার মতবাদের নাম *Transformism*, বা রূপান্তরবাদ। অন্যজনের নাম চার্ল্স্ ডারউইন (Charles Darwin) আসল ও সর্বজনসম্মত বিবর্তনবাদের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা।

রূপান্তরবাদ

রূপান্তরবাদের মূলসূত্র হইল—'অর্জিত জৈব চরিত্রের উত্তরাধিকার' (Inheritance of Acquired Characters)। অর্থাৎ লামার্ক্ বলিলেন যে, প্রাণীবিশেষের জীবন-কালের মধ্যে তাহার আবেষ্টনী

হইতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও বিগঠিত অভ্যাসসমূহ প্রায় পূরাপূরিভাবেই তাহার সন্তানের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। আবেষ্টনীর পার্থক্যে প্রাণীসকলের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসসমূহের বৈচিত্র্য এবং তৎফলে জাতিগত, শ্রেণীগত, আকারগত ও স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।

তাঁহার থিওরির মধ্যে কতকটা সত্য যে নিহিত আছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অ্যান্টনিও মারো প্রথম ইউজেনিক্ কংগ্রেসে বক্তৃতা-দানকালে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন, যেখানে পশুশালা হইতে বাহিরে আসিবার কালে, হঠাৎ দরজা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় একটি ষণ্ডের লাঙ্গুলের অধিকাংশ কাটা পড়ে। অতঃপর উহার বীর্যসম্ভূত সমস্ত বৎসতরই নামমাত্র লাঙ্গুলবিশিষ্ট হয়। মারো গিনি-পিগ্ লইয়া পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করিবার সময়, কতকগুলির দেহ হইতে সায়াটিক্ নার্ভ্ কাটিয়া বাদ দেন; তাহার ফলে উহাদের সকলেরই মৃগীরোগ দেখা দেয়। উক্ত রোগাক্রান্ত গিনিপিগগুলির সন্তান-সন্ততির মধ্যেও অল্প-বিস্তর মৃগীরোগ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

লামার্কের যুক্তি

জলবায়ু, উত্তাপ, আর্দ্রতা, পুষ্টিকর আহার্য প্রাপ্তির সুযোগ, উপবাস-কষ্ট, নিরন্তর পীড়ন-ভয়, অস্বাভাবিক কর্মঠতা, আলস্যপ্রিয়তা প্রভৃতি প্রাণীর স্বভাবের মধ্যে এমন একটি পরিবর্তন আনে, যাহা তাহার বংশধারায় অনুসৃত হয়। কয়েক পুরুষ ধরিয়া কোন একটা অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের অতিরিক্ত চেষ্টা সাধিত হইলে, সন্তান-সন্ততির মধ্যে সেই অঙ্গটির অধিকতর পরিপুষ্টি দেখা যায়; আবার যদি সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

ব্যবহার অল্প করা হয়, তাহা হইলে পরবর্তী বংশধারায় সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইবে। লামার্ক্-পন্থীরা বলিতেছেন যে, জিরাফের পূর্বপুরুষ কতকটা ঘোটকের মত আকারের জন্তু ছিল *। বৃক্ষরাজির উচ্চ শাখাস্থিত পত্র-পল্লবগুলি নাগাল্ পাইবার জন্য ইহাদের আদিম পুরুষ-গণ ক্রমাগত স্কন্ধ-প্রসারণের চেষ্টা করার ফলে, পরবর্তী সন্তানকুলের মধ্যে ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া স্কন্ধ বড় হইতে সুরু করিয়াছে। পরিশেষে অধুনা-দৃষ্ট জিরাফ-বংশের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছে।

অতিশয় প্রাকৃতিক উত্তাপ (রৌদ্রতাপ) কীট-পতঙ্গের গাত্রবর্ণ পরিবর্তিত করিয়া দেয়। মনুষ্যেতর বহু স্তন্যপায়ী প্রাণী ও মনুষ্যদের মধ্যেও দেখা যায় যে, শীতপ্রধান দেশের অধিবাসিগণের চর্ম দুগ্ধধবল, গ্রীষ্ম-মণ্ডল নিবাসীদের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ অথবা শ্যাম হয়। শীতপ্রধান দেশের লোক কয়েক পুরুষ ধরিয়া গ্রীষ্মমণ্ডলে বসবাস করিতে থাকিলে, তাহাদের চর্ম-কোষাণুগুলি একটু একটু করিয়া গাঢ় রঙে রঞ্জিত হইতে থাকে। তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের গাত্রবর্ণ পুরুষানুক্রমে গাঢ় লাল, তাম্রবং, শ্যাম ও শেষে কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। মদ্যস্থিত বিষ, সিফিলিস-ঘটিত বিষ, গণোরিয়া-জনিত গেঁটে বাত, অপস্মার, উন্মাদরোগ ও অন্যান্য রোগের বিষ বা বীজ পরবর্তী সন্তানের মধ্যে অনুসৃত হইতে পারে ও হয়,—ইহা প্রত্যক্ষলব্ধ তত্ত্ব।

* এই জন্তুগুলির নাম 'ওকাপি'। মধ্য-আফ্রিকার গনারণ্যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সার হ্যারি জন্স্টন্ ইহাদের কয়েকটিকে সর্বপ্রথম দেখিতে পান্। ইহারা এখন পৃথিবী হইতে লুপ্তপ্রায়।

ডারউইনের মতবাদ-বৈশিষ্ট্য

ডারউইনের ক্রমবিকাশ বিষয়ক মতবাদের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা স্থান পাইয়াছিল তাঁহার জীবনব্যাপী অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানের ফল-সমন্বিত দুইখানি গ্রন্থে—*The Origin of Species* ও *Descent of Man*এ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষাণুযুক্ত প্রাণী বিভিন্ন পদ্ধতিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর যাবৎ ক্রমবিকশিত হইয়া, বৃহত্তর প্রাণীকুলের—এমন কি, নিষ্পুচ্ছ কপি (Anthropoid apes) ও মনুষ্য জাতির জন্ম দিয়াছে, তাহা তিনি অস্বীকার করিলেন না। জিরাফের প্রলম্বিত স্কন্ধ যে একপুরুষেই হয় নাই—তাহাও তিনি মানিয়া লইলেন। কিন্তু কি পদ্ধতিক্রমে উহা সম্ভব হইল, তাহার এক অভিনব উত্তর দিলেন।

তিনি বলিলেন, কোন অজ্ঞাত-যুগে ওকাপি নামক জিরাফ্দের আদি পুরুষের (ওকাপিদের) কোন সন্তান দৈবাৎ অপেক্ষাকৃত একটু বড় স্কন্ধ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ঐ বিশিষ্ট ওকাপিটি সমবয়স্ক অন্যান্য ওকাপি অপেক্ষা একটু বেশি পরিমাণে বৃক্ষপত্রাদি সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহার ফলে, প্রকৃতি একদিকে এই সৃষ্টিছাড়া জীববিশেষকে যেমন অধিকতর বলিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন, অন্যদিকে আবশ্যকতা-বোধে তাহার উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে তাহার অঙ্গ-বৈষম্যের লক্ষণটি বেশি করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে লাগিলেন। নব-সৃজিত লম্বা-কাঁধওয়ালা জন্তুদের সহিত আহার-সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বে আদিম ওকাপিরা পারিয়া উঠিতেছে না দেখিয়া, প্রকৃতি শেষোক্তদের বংশ ধীরে ধীরে কমাইয়া দিতে সুরু করিলেন।

ডারউইনের জিরাফ্ সম্বন্ধীয় মন্তব্যের মধ্যেই তাঁহার তিনটি মৌলিক

মতবাদের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই মতবাদত্রয়ের নাম হইল—(১) 'আত্মসংস্থানের দ্বন্দ্ব' (Struggle for existence) (২) 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বা প্রকারান্তরে—'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (Natural selection or Survival of the fittest), এবং (৩) 'আকস্মিক বৈষম্য' (Accidental variation).

আত্মসংস্থানের দ্বন্দ্ব

জীবসৃষ্টি বিষয়ে ও মনুষ্যেতর প্রত্যেক প্রাণীকে স্ব-স্ব বংশবিস্তারের ক্ষমতা-দান বিষয়ে প্রকৃতি চিরকালই মুক্তহস্ত। নিম্নতম প্রাণীর মধ্যে সন্তান-জননের এমন একটি সহজ উপায় প্রচলিত আছে, যদ্দ্বারা তাহারা নিমেষে একটি হইতে দুইটি জীবে পরিণত হইতে পারে। বহু শ্রেণীর বীজাণুই প্রতি অর্ধঘণ্টায় একটি করিয়া নূতন জীবাণুর জন্ম দিতে পারে। ইহারা যদি অনুকূল আবেষ্টনী ও নিবিবাদে বংশ-বিস্তারের সুযোগ পায়, তাহা হইলে সকলে মিলিয়া এক সপ্তাহের শেষে পৃথিবীর ন্যায় আকৃতি-সম্পন্ন একটি সুবৃহৎ জীবাণুপুঞ্জের পিণ্ড প্রস্তুত করিতে—কয়েক বৎসরের মধ্যে সৌর জগতের সমস্ত গ্রহকে সন্ততি-জালে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভগবান ইহাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধির পথ নানাভাবে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন!

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্থরপ্রসূ জীব হইল তিমি ও হস্তী। ইহারা একজোড়া স্বামীস্ত্রীতে মিলিয়া যদি জীবন-কালের মধ্যে চারিটি সন্তানের জন্ম দেয়, তাহা হইলে দুইটি হইতে ছয়টি প্রাণীর উদ্ভব হয়। তিমি ও হস্তী-সন্তানগুলি যদি চিরকাল পর্যাপ্ত আহার ও জীবন-ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ পাইত, তাহা হইলে এতদিনে তিমির বংশধরে সমুদ্র-গর্ভ

পরিপূর্ণ—হস্তীর বংশধরে পৃথিবী টলটলায়মান হইত; ইহাদের সংখ্যার চাপে অন্যান্য প্রাণীর অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু যে জাতির জন্মদানের শক্তি যত বেশি, তাহাদের সন্ততির মধ্যে অকালমৃত্যুর বিড়ম্বনা—অন্নসংস্থানের দুঃখ তত বেশি। সুতরাং প্রকৃতিই বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার অবস্থা বিপর্যয় ও প্রতিকূল পরিবেশের দ্বারা সংযত রাখিয়া দিয়াছেন।

প্রাকৃতিক নির্বাচন

প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে আহার-সংস্থানের—তথা জীবন-ধারণ ও আত্মরক্ষার দ্বন্দ্ব চলিতেছে। একখণ্ড মাংস লইয়া কুক্কুরী ও তাহার পুষ্টদেহ শাবকের মধ্যে আঁচড়া-আচ্‌ড়ি কামড়া-কামড়ি চলে দেখিতে পাই। এক-একজাতীয় জীবের নিজেদের মধ্যে এবং বিভিন্ন জাতীয় জীবের পরস্পরের মধ্যে আবহমানকাল চলিয়াছে একটা অবিরাম জীবন-সংগ্রাম। পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার উপযোগী নানারূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ও শক্তি লইয়া বিভিন্ন প্রাণিসম্প্রদায় একটির পর একটি করিয়া পৃথিবীর মল্লভূমে আবির্ভূত হইয়াছে।

যে সম্প্রদায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত আপনাদিগকে খাপ্ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই, আহার সংস্থানের সেরূপ সুযোগ-সুবিধা করিয়া লইতে পারে নাই, তাহারাই ধীরে ধীরে ধ্বংস পাইয়াছে; বাকি সম্প্রদায়গুলি জীবন-সংগ্রামে টিঁকিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার যাহারা সর্বাপেক্ষা বেশি আবেষ্টনীকে আয়ত্তাধীন করিতে পারিয়াছে, প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজেদের সমৃদ্ধির কার্যে লাগাইয়াছে, তাহারা হইয়াছে সৃষ্টি-রাজ্যের যোগ্যতম প্রজা ও তাহাদের দুঃখ-জরার

জ্বালা সহিতে হইতেছে অপেক্ষাকৃত অল্প। এই-যে অনুপযুক্ত প্রাণি-সম্প্রদায়ের বংশ লোপের ও উপযুক্ত প্রাণিসম্প্রদায়গুলি বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের স্থিতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ইহার নাম 'প্রাকৃতিক নির্বাচন।'

আকস্মিক বৈষম্য

এই প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রায় অসম্ভব হইত—যদি জীবসৃষ্টির প্রথমদিন হইতে এযাবৎ সৃষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীগুলি আকৃতি-প্রকৃতিতে মাতা-পিতার সর্বাংশে অনুরূপ হইত। উচ্চ-নীচ সকল প্রাণীর সন্তান-সন্ততিই সকল সময়ে মাতাপিতার রূপ ও স্বভাব হইতে অল্পবিস্তর বিভিন্ন হয়। কোন সন্তানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত বা গুণগত একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের নাম 'আকস্মিক বৈষম্য'। এই বিভিন্নতার উৎপত্তি কেন ও কি করিয়া হয়—তাহার যুক্তিসঙ্গত জবাব সকলক্ষেত্রে দেওয়া কঠিন বটে; কিন্তু উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-জগতে এইরূপ একটা অসাধারণ ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটিয়া যায়, তাহা আমরা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করি। ঐ বৈষম্য যদি কোন প্রাণিবিশেষের জীবন-ধারণের অধিকতর উপযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে বিশ্বপ্রকৃতি তাহাকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রিয়পুত্ররূপে বাছিয়া লন্। তাহার বংশধারায় তখন স্নেহের জোয়ার তর্‌তর্ করিয়া প্রবেশ করে। সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও রীতিমতো বাড়ে, উক্ত বৈষম্য বা বৈকল্যটুকুও একটু একটু করিয়া বাড়িয়া চলে। কয়েক শত বৎসর পরে এইভাবে হয়তো একটি নূতন প্রাণিসম্প্রদায়ের পত্তন হয়।

মানুষের উৎপত্তি

ডারউইনের মতে, নূতন নূতন বৈষম্যের সৃষ্টি ও তাহাদের বাছাই দ্বারাই জগতে এত রকমের প্রাণীর সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার মতবাদ

যদি অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির ওই বাছাই-পদ্ধতি মানুষের বুদ্ধিতে সকল সময় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীত হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে উহা ভাল, মাঝারি, মন্দ ও পক্ষপাতদুষ্ট হইয়াছে বলিতে হয়; তথাপি প্রকৃতি যে শেষ রক্ষা করিয়াছেন—তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহার কঠোর পরীক্ষায় যে-যে প্রাণিসম্প্রদায় ফেল্ করিয়াছে, তাহারা একবারে পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহারা তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে, তাহারা এখনো কোনমতে সংখ্যাল্প সম্প্রদায় হিসাবে বাঁচিয়া আছে; দ্বিতীয় ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ প্রাণীর দল আজও পৃথিবীর বুকে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ততায় বিচরণ করিতেছে। বলা বাহুল্য, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে মানুষ। এবং ইহাও স্থির যে, কপিজাতির এক সম্প্রদায়ের কোনো সন্তানের একটা আকস্মিক বৈষম্যের ফলেই মানুষের উৎপত্তি সম্ভবপর হইয়াছে।

মানুষের মধ্যে যত রকমের স্বভাবগত, বর্ণগত, আকারগত ও আয়ুগত পার্থক্য দেখা যায়, তত আর কোনো মনুষ্যেতর প্রাণীকুলের মধ্যে দেখা যায় না। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে, প্রথমেই পূর্বকথিত লামার্কের মতবাদটির কথা স্মরণে আনিতে হয়। মানুষের বৈচিত্র্যবিধানের জন্য কতকটা দায়ী প্রাকৃতিক পরিবেশ, কতকটা তাহার অব্যবহিত উপরের মাতৃ-পিতৃপুরুষের দোষগুণ, এবং কতকটা তাহার পাঁচ লক্ষ অসাক্ষাৎ পূর্বপুরুষস্বরূপ প্রাণিসম্প্রদায়—যাহাদের মৌলিক আধান-পদ্ধতি (structural scheme) ও মোটামুটি স্বভাবের সংস্কার তাহার সত্তায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সাম্যের মধ্যে অদ্ভুত বৈষম্যের অন্যত ম বিরাট কারণ—মানুষের স্বাধীন বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা ও তাহার বর্তমান কৃষ্টি!

দ্বিতীয় পটল

জীবগণের বংশ-বিস্তারের ধারা

পৃথিবীর আদিম জীবসম্প্রদায়ের সকলেই এককোষাণুযুক্ত। ইহাদের দেহ আছে কি নাই তাহা নির্ণয় করিতে গেলে, আমাদিগকে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। এই চক্ষুর অগোচর প্রাণীদের মধ্যেই সৃষ্টিকর্তা ভাবী বৃহত্তর প্রাণীর অভিব্যক্তির উপযুক্ত মালমশলা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন।

মৌলধাতুর উপাদান

কোন এককোষাণুযুক্ত জীবাণুর মৌলধাতু বা 'প্রোটোপ্লাজ্‌ম্' বিশ্লেষণ করিলে, তাহার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ জল পাওয়া যায়। বাকি অংশ আমিষজাতীয়, শালি (শর্করা) জাতীয় ও স্নেহ (চর্বি) জাতীয় পদার্থের সমষ্টি। যাঁহারা খাদ্যবিজ্ঞানের সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, এই পদার্থত্রয় কার্বন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন, সাল্‌ফার, ফস্ফরাস্ প্রভৃতি রূঢ় উপাদানের বিভিন্নপ্রকার আণবিক সমবায়ে প্রস্তুত। মৌলধাতুর মধ্যে নিরন্তর একটা পরিবর্তন চলিতেছে। পরিবর্তন—অর্থাৎ গঠন-ভঞ্জনের ব্যাপার (*Metabolism*)। দেহভ্যন্তরস্থ নানা রূঢ় পদার্থের বিভিন্ন প্রকারের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের দ্বারা জীবাণু তাহার জীবনী-শক্তিকে অব্যাহত রাখিবার প্রয়াস করে। প্রথমত, ইহা নিজের বৃদ্ধির উপায় খুঁজে, এবং একটা সীমা পর্যন্ত

বৃদ্ধি পাইয়া যখন দেখে আর বাঁচিবার উপায় নাই, তখন নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুইটি নূতন সন্ততির জন্ম দেয়।

জীবাণুদের জীবন-ধারণ পদ্ধতি

মৌলধাতুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য এককোষাণুযুক্ত জীবকে বাহির হইতে উপাদান আনিয়া স্বদেহভুক্ত (Anabolism) করিতে হয়। বৃদ্ধির চেষ্টায় নিজের মধ্যে যে শক্তিক্ষয় হয়, তাহার পরিপূরণ এবং অপ্রয়োজনীয় অংশের পরিবর্জনও (Katabolism) আবশ্যক। প্রাণীমাত্রেই যে কর্মচাঞ্চল্য প্রকাশ করে, তাহার অর্থ হইল—তাহারা বাহির হইতে তাহাদের প্রাণশক্তির সরবরাহ চাহে। প্রায় সমস্ত প্রাণীদেহেই বাহির হইতে যে উপাদান (খাদ্য) যায়, তাহার একাংশ দেহের সহিত একীভূত হয়, অন্য অংশটি অক্সিজেন সাহায্যে পুড়িয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া ক্রিয়াশক্তিতে পরিণত হয়। সেইজন্য জীবাণু ও অন্যান্য প্রাণীদের জল বা বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিতে হয়।

অক্সিজেন-গ্রহণের পদ্ধতি জীব-জীবনের ক্রম-বিকাশের সহিত ক্রমোন্নতি-লাভ করিয়াছে। কীট-পতঙ্গ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী জন্তুর মধ্যে শ্বাস-গ্রহণের একটা সুস্পষ্ট প্রণালী (নাসিকা ও শ্বাসনালী) ও শরীরের মধ্যে অক্সিজেন-বাষ্প শোষণের প্রকৃষ্ট যন্ত্র (ফুস্‌ফুস্) পুরুষানুক্রমে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের নাসিকার মধ্য দিয়া নিরন্তর বায়ু প্রবেশ করিয়া, ফুস্‌ফুসে গিয়া যেমন অক্সিজেন প্রদান ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড্ গ্রহণ করিতেছে, মৎস্য ও তজ্জাতীয় জলচর জীবের 'কান্‌কোর' মধ্যে তেমনি নিরন্তর জল প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থ অক্সিজেন-বাষ্প বিতরণ করিয়া আসিতেছে।

বংশরক্ষার আয়োজন

প্রাণ-ধারণের ব্যবস্থা তো হইল, এইবার বংশরক্ষার আয়োজন চাই। যৌনধর্মের—অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের প্রতিষ্ঠা জীব-সৃষ্টির প্রারম্ভেই হয় নাই। এক্ষেত্রে কবির সেই অমর ছত্রটিকে ঈষৎ বদল করিয়া বলা যায়—'ভবতি বিজ্ঞতমা ক্রমশঃ প্রকৃতি'। মহাপ্রকৃতিকে এক এক প্রকার জীবসৃষ্টি ও তাহার প্রাণধারণ—বংশবিস্তারণের ব্যবস্থাদি করিয়া সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া তাহার কার্যকারিতা লক্ষ্য করিতে হইয়াছে—নিজের ভুল-ভ্রান্তি নিজেকেই ধরিতে ও তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইয়াছে। যেন নিজেই শিক্ষক, নিজেই ছাত্র,—কেবল খাতার পাতায় কাটাকাটি, মোছামুছি এবং আদর্শানুরূপ লিখন-বিভঙ্গের দুষ্কর সাধনা!

এককোষাণু জীবের জন্মদান-পদ্ধতি

নিম্নতম শ্রেণীর এককোষাণুযুক্ত জীবকুলের বংশ-বিস্তার-পদ্ধতি অত্যন্ত সরলভাবের। ইতঃপূর্বে সংক্ষেপে বলিয়াছি যে, উহারা আপন আপন দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুইটি নূতন সন্তানের সৃষ্টি করে। একটি বীজাণুর মোটামুটি জীবন-কাল কুড়ি মিনিট হইতে অর্ধঘণ্টা। তারপর প্রাণবিন্দু সমেত কোষাণুর মধ্যস্থল একটু একটু করিয়া বিদারিত হইতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে কোষাণুর অর্ধেক মৌলধাতু ও অর্ধেক প্রাণবিন্দু প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া অবশেষে এই দুইটি অংশ একেবারে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। নবজাত জীবাণু দুইটির প্রাণবিন্দুটুকু কেন্দ্রস্থলের দিকে সরিয়া যায়। ইহারা আবার পিতৃপুরুষের ন্যায় আবেষ্টনী হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া অর্ধঘণ্টা কাল ক্রমশ পুষ্ট হইতে থাকে। এই

সংক্ষিপ্ত জীবন-কালের মধ্যে অবশ্য আহার ও অক্সিজেনের অভাবে অথবা প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে ইহারা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

এককোষাণুযুক্ত প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশ ও তাহার সন্তানোৎপাদন-রীতি বহু বৎসর যাবৎ জীবাণু-বৈজ্ঞানিকগণের পর্যবেক্ষণের বিষয় ছিল। তাঁহারা অণুবীক্ষণ-যন্ত্র ও নানাবিধ কৃত্রিম বর্ণের সাহায্যে ইহাদের অঙ্গ-সংস্থান অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছেন।

প্রাণবিন্দুর মধ্যে এক বা একাধিক গোলাকার 'প্রাণকণিকা' (Nucleoles or Nucleolar corpuscles) অবস্থান করে; তদুপরি অতি সূক্ষ্ম তন্তুময় জালবৎ একপ্রকার পদার্থ প্রাণবিন্দুর আগাগোড়া বিস্তৃত হইয়া আছে। এই জালবৎ পদার্থ কৃত্রিম লাল রঙের দ্বারা সহজে রঞ্জিত করা যায় বলিয়া, ইহার নাম রাখা হইয়াছে 'বর্ণদাম' (Chromatin). প্রাণবিন্দুর অর্ধতরল বস্তু বর্ণদামের এক-একটি ঘরার মধ্যে যেন আটকাইয়া আছে।

বর্ধিত কোষাণুর নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সন্তান সৃষ্টি করার নাম 'স্বচ্ছেদন-ক্রিয়া' (Mitosis). এই ব্যাপার কয়েকটি ক্রম-পরম্পরায় সম্পূর্ণ হয়। মুখপত্রের দ্বিবর্ণ চিত্রে স্বচ্ছেদন-ক্রিয়ার ক্রমগুলি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক অনুচিত্র—স্বচ্ছেদন-ক্রিয়া আরম্ভের পূর্বাবস্থা দেখান হইয়াছে। এই সময় প্রাণবিন্দুর গাত্রে একটু ফাট্ ধরে। চিত্রে প্রাণবিন্দুটি b অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত। ইহার সন্নিকটে মৌলধাতুর মধ্যে আর একটি পদার্থ c অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত; উহার নাম 'কেন্দ্রকণিকা' (Centrosome)।

খ অনুচিত্র—কোষাণু স্বচ্ছেদন-ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

বর্ণদাম যেন তাহার জাল গুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ সঙ্কুচিত হইতেছে। কেন্দ্রকণিকা দুইভাগে বিভক্ত হইতেছে।

গ ও ঘ অনুচিত্র—ইহার পর বর্ণদামের কণাগুলি প্রাণবিন্দুর মধ্যস্থলে একত্রিত হইয়া কয়েকটি ঈষৎবক্র দণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই দণ্ডাকার বস্তুগুলির নাম 'বর্ণশুঙ্গ' (Chromosomes)। এক-এক জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে বর্ণশুঙ্গের সংখ্যার তারতম্য হয়; কোনটিতে দুইটি, কোনটিতে চারিটি, কোনটিতে আটটি, কোনটিতে বারোটি। কেন্দ্রকণিকাদ্বয় পৃথক হইয়া প্রাণবিন্দুর দুই বিপরীত দিকে সরিয়া আসিয়াছে। বর্ণশুঙ্গগুলি ক্রমশ স্থূল ও হ্রস্ব হইতেছে। প্রাণবিন্দু অস্পষ্ট হইয়া মৌলধাতুর মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতেছে।

ঙ অনুচিত্র—তারপর বর্ণশুঙ্গগুলি কোষাণুর মাঝামাঝি স্থলে আপনাদিগকে একটি সরলরেখায় বিন্যস্ত করিয়া লইতেছে (ডিলের সময় সৈন্যেরা যেরূপ দাঁড়ায়) এবং দুইটি কেন্দ্রকণিকার মাঝে যেন একটা প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর তুলিয়া দিতেছে।

চ অনুচিত্র—বর্ণশুঙ্গগুলির প্রত্যেকটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া, গণিতের সমান-চিহ্নের ন্যায় সমান্তরালভাবে সজ্জিত হইয়াছে।

ছ অনুচিত্র—উল্লিখিত পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রকণিকাদ্বয়ের চতুর্দিকে একপ্রকার ক্ষীণ নাক্ষত্রিক জ্যোতির সমাবেশ হইয়াছে। এই বিচিত্র আলোকের কয়েকটি বিচ্ছুরিত রশ্মিরেখা বর্ণশুঙ্গগুলির এক-এক প্রান্ত স্পর্শ করে এবং উভয়দিকের কেন্দ্রকণিকার দিকে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে।

জ অনুচিত্র—এইভাবে প্রত্যেক কেন্দ্রকণিকার চারিদিকে সমানসংখ্যক বর্ণশুঙ্গের বিন্যাস ঘটিতেছে।

ঝ অনুচিত্র—সঙ্গে সঙ্গে কোষাণুটি একটু স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যাসরেখা বরাবর ইতঃপূর্বে বর্ণশুঙ্গগুলি দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার উভয় প্রান্ত একটু একটু করিয়া ফাঁক হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময় হইতে অস্পষ্ট প্রাণবিন্দুর আঠাল বস্তু দুইভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক দিকের বর্ণশুঙ্গবৃন্দের চতুর্দিকে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। পূর্বোক্ত জ্যোতিচ্ছটা নিষ্প্রভ হইয়া গেল; কোষাণু আপন প্রাবরণীর (cell-wall) মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত হইল।

ঞ অনুচিত্রে—এইবার প্রাবরণী দ্বিভিন্ন করিয়া দুইটি ক্ষুদ্র কোষাণু-শিশু বাহিরে আসিল। বর্ণশুঙ্গগুলি তাড়াতাড়ি প্রাণবিন্দুর মধ্যে আকার পরিবর্তন করিয়া বর্ণদামে পরিণত হইল। বলা বাহুল্য, উভয় কোষাণুই সর্বাংশে তাহার মাতৃকোষাণুর অনুরূপ হইয়া উঠিল।

প্রজীবের জীবন্ত উপনিবেশ

এক হইতে এমনি করিয়া দুইটি নবজীবনের বিকাশ হয়। প্রায় সর্বজাতীয় এককোষাণুযুক্ত জীবের নূতন সন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়াই পৃথক হইয়া যায়। আবার কতকগুলি প্রজীব আছে, যাহাদের নূতন সন্তানগুলি জন্মগ্রহণের পর গায়ে গায়ে জোড়া লাগিয়া থাকে, এবং এমনি করিয়া শত সহস্র প্রজীব ক্রমাগত জন্মিয়া গায়ে গায়ে লগ্ন হইয়া একটা জীবন্ত পারিবারিক উপনিবেশ গঠন করে। 'ভলভক্স' (Volvox) নামক এক প্রকার ক্ষুদ্রতম প্রাণী পাঁচ হাজার, দশ হাজার সংখ্যা চক্রাকারে একত্র সংলগ্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহারা চর্মচক্ষে একটা অকারবিশিষ্ট প্রাণী বলিয়া ধরা পড়ে। খাল অথবা দীঘির জলে ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ সবুজ ভাঁটার আকারে ইহাদিগকে একত্র ভাসিতে দেখা যায়।

পরিস্ফুরণ-ক্রিয়া

আবার কতকগুলি এককোষাণুযুক্ত প্রাণী আছে, যাহাদের জন্ম হয় 'পরিস্ফুরণ-ক্রিয়া' (budding) দ্বারা। একটি প্রাণীর প্রাণবিন্দু কয়েকটি অংশে বিভক্ত হইয়া, মৌলধাতুর প্রান্ত ঘেঁষিয়া অনেকটা ফুলের পাঁপ্‌ড়ির ন্যায় সজ্জিত হয়। প্রত্যেক খণ্ডিত প্রাণবিন্দুর মধ্যেই অবশ্য সমান সংখ্যক বর্ণগুস্ত ও একটি করিয়া কেন্দ্রকণিকা আসিয়া বাসা বাঁধে, এবং উহাদের প্রত্যেকের চারিপার্শ্বে একটু করিয়া মৌলধাতু পুঞ্জীভূত হয়। ক্রমশ খণ্ডিত প্রাণবিন্দুর চতুষ্পার্শ্বস্থ মৌলধাতু বিদারিত হইতে থাকে। তারপর একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটি মাতৃকোষাণু হইতে চারিটি, আট্‌টি অথবা ষোলটি শিশুকোষাণু যুগপৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

এইভাবে একজাতীয় বৃহদাকার (তথাপি চক্ষুর অগ্রাহ্য) অম্বাণু প্রজনন সাধন করে; ইহাদের ইংরাজী নাম Giant Amœba বা Pelomyxa. ভেকের দেহমধ্যস্থ খাদ্যনালীর শেষপ্রান্তে 'ওপালিনা' নামক একশ্রেণীর এককোষাণুযুক্ত জীবাণু বসবাস করে। ইহাদের জন্মদান-কার্য পরিস্ফুরণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। মানুষের রক্তকণার মধ্যে ম্যালেরিয়া-জীবাণু প্রবেশ করিয়া ঠিক এইভাবেই বংশবিস্তার করে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ম্যালেরিয়া-জীবাণুর এককালীন্ পরিস্ফুরণের নিমিত্ত প্রবল জ্বরের সহিত এত কম্পন দেখা দেয়।

আদিম বহুকোষাণুযুক্ত জীব

অতিক্ষুদ্র জলজ কীট, প্রবাল-কীট, পুরুভুজ জাতীয় জীব, স্পঞ্জ্ (Proterosponzia) প্রভৃতি দ্বারা বহুকোষাণু জীবের প্রথম পত্তন

হইয়াছিল। ইহাদিগকে দেখিয়া 'দেহী' বলিয়া আমাদের স্পষ্ট ধারণাও জন্মে। নানা প্রকার স্থলচর কীট, পতঙ্গ, শুক্তি, শম্বুক ও শুঁয়া জাতীয় জীব অবশ্য ইহাদের পরে বিবর্তিত হইয়াছে। ইহাদের জন্মদান-পদ্ধতি কিরূপ, তাহা এখনই বলিব। বহুকোষাণুযুক্ত প্রাণী—ছোট হোক্ বা বড় হোক্ এবং যত বিভিন্ন জাতীয়ই হোক্ না কেন, তাহাদের দেহের কোষাণুগুলি একজাতীয় নহে। বৃক্ষের কোষাণু হইতে যেমন নানা জাতীয় অসংখ্য কোষাণুর সৃষ্টি হইয়া, উহাদের সমন্বয়ে মূল, কাণ্ড, শাখা, পাতা, কুঁড়ি, ফুল ও ফলের দেহ নির্মিত হয়, তেমনি মানুষের গাত্রচর্ম, গ্রন্থি, উদর, রক্ত, পেশী, নাড়ী, মস্তিষ্ক, পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতিও বিভিন্ন জাতীয় কোষাণুর বৃহৎ সমষ্টি দিয়াই গঠিত হইয়া থাকে।

যৌন-প্রজনন-পদ্ধতি

বহুকোষাণুবিশিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করিতে বসিয়া, বিশ্বপ্রকৃতির মনে যৌনধর্মের পরিকল্পনা যখন প্রথম জাগিয়া উঠিল, তখন স্ত্রী ও পুরুষ নামক দুইটি পৃথক সত্তার তাহাকে উদ্ভাবন করিতে হয়। এই সময় হইতে জন্মদান-ব্যাপার পূর্বাপেক্ষা জটিল হইয়া পড়ায়, প্রকৃতিকে শ্রম-বিভাগের একটা ব্যবস্থাও প্রবর্তিত করিতে হইয়াছে। একটা মাছি, একটা পাখী, একটা খরগস বা একটা ছাগল নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া নূতন সন্ততির জন্ম দিতেছে—এরূপ উদ্ভট-কল্পনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু একটা কিঞ্চলুক (কেঁচো) বা জলজ পুরুভুজকে (water hydra) দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুইটি পৃথক প্রাণীর সৃষ্টি করা অসাধ্য নহে। ইহা অবশ্য ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত!

সন্তান-জননের উদ্দেশ্যে পুরুষের দেহে একপ্রকার বিশিষ্ট কোষাণুর সঞ্চার হইল, তাহার নাম 'শুক্রকোষাণু' বা 'শুক্রকীটাণু' (Sperm-cell);

এবং স্ত্রীজাতির দেহে একপ্রকার বিশিষ্ট কোষাণুর সৃষ্টি হইল, তাহার নাম 'অণ্ডকোষাণু' (egg-cell). আমরা প্রথমোক্তকে সংক্ষেপে বলিব 'শুক্রাণু' ও দ্বিতীয়োক্তকে বলিব 'অণ্ডাণু'। ইহাদের প্রত্যেককেই 'কোষাঙ্কুরক' (germinal cell)—এই সাধারণ নামে অভিহিত করা চলে।

শুধু জীব-জগতে নহে, উদ্ভিদ-জগতেও বহু বৃক্ষের মধ্যে যৌনধর্মের প্রবর্তন হইয়াছিল। ইতঃপূর্বে কিন্তু নিম্নস্তরের বৃক্ষসমূহ স্বচ্ছেদন বা পরিস্ফুরণ-দ্বারাই নিজেদের বংশরক্ষা করিতেছিল। কোন কোন বৃক্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলে, তাহাদের খণ্ডিতাংশ হইতেও আর একটি নূতন বৃক্ষের সমুদ্ভব হয়।

যৌন-পদ্ধতির সুবিধা

যৌন-প্রজনন-পদ্ধতিতে কয়েকটি সুবিধা দেখা গেল। যথা—(১) দুইটি, চারিটি বা ষোলটির বহুগুণ অধিক সংখ্যক সন্তানের একই সময়ে জন্ম দেওয়া [মৎস্য, কীট, পতঙ্গ ও কতকগুলি সরীসৃপ জাতীয় জীবের পক্ষে] সহজসাধ্য হয়। (২) দুই পৃথক পাত্রে দুই প্রকারের 'কোষাঙ্কুরক' (germinal cells) থাকায়, একের পক্ষে অপরের কোনরূপ দৈন্য পূরণ করার সম্ভাবনা থাকে। শুক্রকোষাণু ক্ষুদ্রতর দেহ ও গতিশক্তি প্রাপ্ত—অণ্ডকোষাণু বৃহত্তর শরীর-বিশিষ্ট ও স্থিতিশীল হইল। একটিকে অপরটির কাছে আসিয়া তাহার সহিত যুক্ত হইয়া সমপরিমাণ সহায়তা-দ্বারা সন্তানোৎপাদনের সূত্রপাত করিতে হওয়ায়, প্রজাসৃষ্টি-ব্যাপারে শ্রম-বিভাগ দেখা দিল। (৩) স্ত্রী অথবা পুরুষের সামান্য কোন অঙ্গ-বৈকল্য, ক্ষতচিহ্ন, সাময়িক অসুস্থতা প্রভৃতি সন্তানে অনুসৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিল না। (৪) বিভিন্ন পরিবেশ হইতে

বিভিন্নভাবে অর্জিত অভ্যাস-সমন্বিত স্ত্রী-পুরুষের মিলনের (amphimixis) ফলে অপত্যে নানারূপ শারীর ও গুণগত পার্থক্য সৃষ্টির ও উৎকর্ষ-সাধনের সম্ভাব্যতা রহিল।

যৌন-প্রজননের বৃহত্তর উদ্দেশ্য

যৌনধর্ম প্রবর্তনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য কি, তাহা লইয়া বহু জীবতাত্ত্বিকদের মধ্যে নানামুখীন্ অনুধ্যান চলিয়াছে। কিন্তু সকলেই একবাক্যে একটি বিষয় স্বীকার করিতেছেন যে, sex is a device to increase constitutional vigour—a stimulus to further development অর্থাৎ ধাতুপ্রকৃতিগত শক্তি বৃদ্ধি করাই যৌনধর্মের লক্ষ্য। স্ত্রী বা পুরুষের কাহারো কোনোরূপ দৈহিক বা মানসিক অভাব থাকিলে, তাহা যেমন অপরে পরিপূর্তি করিতে পারে ; আবার উভয়ের মধ্যে চারিত্রিক সাদৃশ্য বা আধ্যাত্মিক খর্বতা থাকিলে, তাহা পরবর্তী উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে নিশ্চিতভাবে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এইজন্য স্বপরিবার ও স্বগোত্রের মধ্যে বিবাহের রীতি পৃথিবী হইতে প্রায় রহিত করিয়া দিতে হইয়াছে।

একপাত্রে যৌন ও অযৌন প্রজনন

কতকগুলি উদ্ভিদ ও নিম্ন-শ্রেণীর প্রাণিসম্প্রদায়ের মধ্যে যৌন ও অযৌন উভয় প্রকার পদ্ধতিতে প্রজননের ব্যবস্থা আছে। দেখা যায়, যখন খাদ্য প্রচুর পাওয়া যায় এবং পরিবেশ অনুকূল থাকে, তখন অযৌনভাবে প্রজনন চলে। যখনি খাদ্যের অপ্রাচুর্য ও আবেষ্টনীতে অসুবিধার (শীত ঋতু, অতিপ্লাবন, অতিগ্রীষ্ম প্রভৃতির) সূত্রপাত হয়, তখনি যৌন পদ্ধতিতে সন্তানোৎপাদন-ক্রিয়া আরব্ধ হয়।

নগণ্যদেহ বহু প্রাণীর স্ফুটনোপযোগী জীবাঙ্কুর (Zygote, অর্থাৎ

একত্রযুক্ত অণ্ডাণু ও শুক্রাণু) ও জীবাণুগণ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইলে, তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার জন্য নিজের চারিপার্শ্বে একটি জড় উপাদানময় শক্ত খোলার সৃষ্টি করে এবং তাহার মধ্যে অনাহারে অস্ফুট, মূঢ় অবস্থায় নিশ্চিন্তে কাল-যাপন করে—যতদিন পর্যন্ত না সুদিন ফিরিয়া আসে। এই জাতীয় সকল প্রাণীই মানুষের ন্যায় অতিরিক্ত শীতাতপ সহিতে পারে না; অথচ উহাদের অস্ফুট জীবাঙ্কুরগুলি প্রায়শ জমাট বরফের মধ্যে বহুদিন অবধি, অথবা ৪০°—৪৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ আপনাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। কুড়ি বৎসর পরেও উদ্ভিদের একটা শুষ্ক বীজ ভিজা মাটিতে পুঁতিয়া তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইতে দেখা গিয়াছে। একটা যক্ষ্মা-জীবাণু ছয়মাস কাল মৃঢ় অবস্থায় থাকিয়া, পরে অনুকূল অবস্থা পাইয়া ত্বরিৎ বংশবৃদ্ধি করিতে পারে।

জীবনের সংজ্ঞানির্দেশ

জীবন কাহাকে বলে, তাহার একটা সামান্য সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে। অবশ্য একটা সামান্য সংজ্ঞা রচনা করিতে গেলে বলিতে হয়—জীবন তাহাই, যাহার একটা লক্ষণ গতি, একটা লক্ষণ বৃদ্ধি, আর একটা লক্ষণ সন্তানোৎপাদন। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই সংজ্ঞার প্রথম অংশটি উদ্ভিদ-রাজ্যের প্রতি প্রযোজ্য নহে; অথচ বৃক্ষলতা প্রাণবন্ত, জন্মমৃত্যুশীল। আবার বহুপ্রকার প্রজীব, ফল ও ফুলগাছের বীজ এবং প্রাণীর জীবাঙ্কুরসমূহের উপরি-বর্ণিত মৃঢ় অবস্থা লক্ষ্য করিলে, আমরা সংজ্ঞার সমস্ত অংশটুকুকেই কাযে লাগাইতে পারি না। অনুকূল ক্ষেত্র না পাইলে ইহারা নড়েও না, বাড়েও না, নবজন্মের বিকাশও করে না। অথচ ইহাদিগকে কোনমতে জীবনহীন বলাও চলিবে না। বড় জোর এই পর্যন্ত বলিতে পারা

যায় যে, উহারা মৃতবৎ, নির্জীব, নিষ্প্রাণ। অনুকূলক্ষেত্র পাইলেই আবার ইহারা আমাদের সংজ্ঞানুযায়ী লক্ষণগুলি পরিস্ফুট করিতে পারে।

মূঢ় অবস্থা ও মৃত অবস্থা বুঝাইতে গিয়া এস্থলে দেওয়াল-ঘড়ির একটা পুরাতন উপমার উল্লেখ করা বোধহয় অসমীচীন হইবে না। জীবের মূঢ় অবস্থা হইল একটা দেওয়াল-ঘড়ির মতো—যাহাতে দম-দেওয়া আছে অথচ যাহা চলিতেছে না; কেবল একবার উহার দোলক-যন্ত্রটিকে একটু স্পর্শ করিলেই উহা চলিতে আরম্ভ করে, পূর্ববৎ সময়-নির্দেশ করে ও বাজে। মৃত অবস্থা হইল,—ঘড়ির দোলক্-যন্ত্র, কাঁটা, ফ্রেম্, ডায়াল্ প্রভৃতি সবই ঠিক আছে, কিন্তু মেন্ স্প্রিং ও হেয়ার স্প্রিং ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে।

অপৈত্রজনন

নিম্নশ্রেণীর প্রাণী-জগতে আর এক প্রকার জনন-ক্রিয়া দেখা যায়, তাহার নাম 'অপৈত্রজনন' (Parthenogenesis), অর্থাৎ স্ত্রীজাতীয়েরা পুরুষদের শুক্রাণুর সহায়তা ব্যতিরেকেই তাহাদের অণ্ডাণুকে জীবাঙ্কুরে পরিণত করিতে ও তাহা হইতে সন্তানের জন্ম দিতে পারে। কয়েক সম্প্রদায়ের পিপীলিকা ও মাছি সময়বিশেষে এই অদ্ভুত জনন-ক্রিয়ায় পারদর্শিতা দেখায়। বলা বাহুল্য যে, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী ও সরীসৃপ জাতির ভিম—স্ত্রীলোকের অণ্ডাণুর সহিত পুরুষের শুক্রাণুর সম্মিলন না হইলে, উৎপন্ন হইতে পারে না।

সবুজ মাছির জনন-রীতি

ফুল ও ফলের বাগানে (বিশেষভাবে গোলাপ-বাগানে) সবুজবর্ণের মাছি বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালই ইহাদের উৎপাতের সময়। ঐ সময় ইহাদের স্ত্রীলোকেরা প্রচুর আহার করিয়া নিত্য

বহু সংখ্যক ডিম পাড়ে। এই ডিমগুলি পুরুষ-সঙ্গমের অভাবেই প্রস্তুত, এবং যথাসময় সেগুলি ফুটিয়া মক্ষিশিশু নির্গত হয়। ভর্তৃহীনা সবুজ মাছিগুলির স্বোৎপাদিত ডিমগুলি ফুটিয়া কেবলই স্ত্রী-মাছির জন্ম হয়। এইভাবে একটি উপনিবেশে দুই মাসের মধ্যে কোটি কোটি স্ত্রীমাছি জন্মে। ইহাদের মধ্যে সাবেক কালের যে কয়টি পুরুষ-মাছি টিঁকিয়া থাকে, তাহাদের প্রায় সকলেই অন্ন-সংস্থানের দ্বন্দ্বে একে একে মারা পড়ে। হেমন্তের সূত্রপাতে অপৈত্রজাত মাছিগুলির অর্ধেক সংখ্যক সন্তান হয় স্ত্রী, বাকি সংখ্যা হয় পুরুষ। ইহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পর যৌন সংযোগ না করিলে, আর অণ্ড উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই।

মধুমক্ষিকার জনন-রীতি

মধুমক্ষিকার অপৈত্রজননের রীতি আবার একটু অন্য ধরণের। মক্ষিরাণী হইল স্ত্রীমাছি—আকারেও বড়, বয়সেও বড়; সাধারণত একটি মধুচক্রে একটি মক্ষিরাণীই রাজত্ব করে। পুংমক্ষিগুলি তাহার তাঁবেদার, নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া শুধু মধু খায়, মধু সংগ্রহ করিবার তাহাদের প্রবৃত্তি নাই। দুই-এক বৎসর অন্তর একটা সময় আসে, যে সময় মক্ষিরাণীর গর্ভধারণের প্রেরণা জন্মে; তখন পুংমক্ষিগুলিকে সে যৌন-সম্মিলনে আহ্বান করে। সর্বাপেক্ষা বলশালী ও দ্রুতগামী একটি পুংমক্ষি শূন্যপথে উড্ডীয়মান অবস্থায় মক্ষিরাণীর কুক্ষি-মধ্যে বীর্যনিষেক করিলে, মক্ষিরাণী নিশ্চিন্ত হয়। ইহার পর সে এক বৎসর বা দুই বৎসর ধরিয়া মাঝে মাঝে আপন খুশিমতো ডিম পাড়িয়া চলে—এক শত, দুই শত, চারিশত, ছয় শত, আট শত। ডিম প্রসবের কয়েকদিন পরে বাচ্ছা-মাছি বাহির হয়। উহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি পুরুষ, কোন্‌গুলি স্ত্রী হয় জানেন? যে অণ্ডাণুগুলি পুরুষ-মক্ষির শুক্রাণু-সংযোগে ডিম্বে পরিণত হয়, তাহারা স্ত্রী-মক্ষিশিশুরূপে

পরিস্ফুট হয়; আর যাহারা অপৈত্রজননের ফলে উৎপন্ন হয়, তাহারা হয় পুরুষমক্ষি। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা জানাইয়া রাখা কর্তব্য যে, এক মক্ষিরাণী ব্যতীত আর সমস্ত স্ত্রীমক্ষিকাগুলিই বন্ধ্যা থাকে।

কৃত্রিম অপৈত্রজনন

অপৈত্রজননের ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া, Loeb প্রমুখ একদল জীব-বৈজ্ঞানিকের মনে স্ত্রী-অণ্ডাণুকে কৃত্রিম উপায়ে ডিম্বে পরিণত করিয়া তাহা হইতে পুষ্টাঙ্গ শাবক বিকাশিত করার কল্পনা জাগ্রৎ হয়। ইহাদের চেষ্টায় তারামাছ (star-fish) প্রভৃতি কতকগুলি সামুদ্রিক মৎস্যের ডিম্ব সমুদ্র-জল অপেক্ষা বেশি লবণাক্ত জলে রাখিয়া ও তাহাকে শুক্রাণুর সংস্পর্শে আদৌ আসিতে না দিয়া, তাহা হইতে মৎস্য-শিশু ফুটানো সম্ভবপর হইয়াছে।

ভেক-স্ত্রীর অণ্ডাণুর গাত্র একটি অতি সূক্ষ্ম সূচ্যগ্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া, তাহাকে পুরুষ-শুক্রাণুর নিষেক ব্যতীতও ক্রমপরিণতির পথে চালিত করা যায়—তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। ইহার পর বৈজ্ঞানিক-গণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, নিম্নশ্রেণীর প্রাণিকুলের স্ত্রী-অণ্ডাণুর মধ্যে নূতন জীবসৃষ্টির সর্বপ্রকার যন্ত্রকৌশলই লুক্কায়িত আছে, কেবল উহার পুরুষ-শুক্রাণুর সংযোগ হইতে আত্মপুষ্টির একটা অনুপ্রাণনা পায় (stimulus to development); এই অনুপ্রাণনা প্রায়শ অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম-ভাবে বাহির হইতে দেওয়া সম্ভব। তাঁহারা প্রমাণ করিলেন যে, 'বাওয়া ডিম' কথাটা একেবারে কবির কল্পনা নহে।

উদ্ভিদরাজ্যে বংশবিস্তার-রীতি

বহু শ্রেণীর বৃক্ষে যৌন ও অযৌন উভয় প্রকার পদ্ধতিতেই বংশ-

বিস্তার হইতে দেখা যায়—বিশেষভাবে ফুলগাছগুলিতে। আবার কয়েক শ্রেণীর গাছে একমাত্র যৌন পদ্ধতিতেই বংশবিস্তার-রীতি প্রচলিত। এক শ্রেণীর প্রত্যেক গাছে শুধু স্ত্রীজাতীয়, অন্য শ্রেণীর প্রত্যেক গাছে শুধু পুরুষজাতীয় ফুল ফুটে; আবার তৃতীয় এক শ্রেণীর প্রত্যেক গাছে উভয় যৌনধর্মী ফুলই ফুটিয়া থাকে।

জবা, কাপাস, স্থলপদ্ম, বনকাপাস, কালকাসুন্দা, রজনীগন্ধা, বক, সরিষা, কাটালি-চাঁপা, আতসী, বকুল, শিমুল প্রভৃতি গাছের প্রত্যেকটি ফুলে কতকটা অংশ পুংলিঙ্গাত্মক, বাকি অংশ স্ত্রীলিঙ্গাত্মক। অর্থাৎ এই সকল ফুলে একাধিক পুংকেশর বা পরাগকেশর থাকে। উহাদের প্রত্যেকের মাথায় ক্ষুদ্র পেটিকার মতো রেণুস্থলী আছে; ঐ রেণুগুলি হইল প্রাণী-দেহের শুক্রাণুর অনুরূপ। আবার ফুলের মধ্যস্থলে থাকে এক বা একাধিক গর্ভকেশর, উহাদের মাথায় রহিয়াছে সচ্ছিদ্র গর্ভাধার। রেণুগুলি কোন প্রকারে গর্ভাধারের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে, উহারা সরাসরি এক বা একাধিক প্রকোষ্ঠ-সমন্বিত পুষ্পের তলদেশস্থ বীজকোষের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং স্ত্রী-অণ্ডাণুর (ovules) সহিত একাত্ম হইয়া সত্যকার বীজ উৎপাদন করে। ঐ বীজকোষটিই সাধারণ অবস্থায় ফলে পরিণত হয়। ফলমধ্যস্থ পরিপক্ব বীজ-গুলিই বৃক্ষের ভাবীসন্তাব্য বংশধর।

শশা, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে, চিচিঙ্গে, কাঁটাল, পেঁপে, পিটুলি, লাল-ভেরেণ্ডা প্রভৃতি গাছে স্ত্রী-পুষ্প ও পুরুষ-পুষ্প পৃথক্ পৃথক্ থাকে। সূর্যমুখী ফুলের কতকগুলি স্ত্রীধর্মাত্মক ও কতকগুলি উভধর্মী হয়। স্ত্রী-পুষ্পে শুধু গর্ভ-কেশর ও বীজকোষ, এবং পুরুষপুষ্পে কেবল রেণুস্থলী-সমেত কতকগুলি পুংকেশর থাকে। পুরুষপুষ্পের রেণু সাধারণত

স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাধারে বহিয়া আনে প্রজাপতি, মৌমাছি, পিপীলিকা, কাঠবিড়ালী, ছোট ছোট পাখী, বায়ু ও জল।

পাটা-শেওলার যৌন মিলন

যে-সকল গাছ জলে জন্মে, তাহাদের ফুলের মিলন প্রায়শ জল-স্রোতের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। এই সকল জলজ উদ্ভিদ শ্রেণীর মধ্যে পাটা-শেওলার (Vallisnaria spiralis) মিলন-রীতি অতি অদ্ভুত। উহা বহুলাংশে স্ত্রী-পুরুষের যৌন সংযোগের অনুরূপ বলিলেই চলে। অনেকেই বোধহয় জানেন যে, পাটা-শেওলার গুচ্ছযুক্ত মূল জলের তলায় পুকুরের পাঁকে পোতা থাকে, এবং মূলের শিরভাগস্থ খর্বাকার কাণ্ডের চারিপার্শ্ব হইতে লম্বা লম্বা পাতার গোছা বাহির হইয়া জলপৃষ্ঠের কিছু উপর পর্যন্ত উঠিয়া থাকে। ইহার পাতাগুলি তিন-চারি হস্ত দীর্ঘ ও অর্ধ অঙ্গুলি পরিমিত চওড়া হয়।

পাটা-শেওলার এক গাছে কেবল স্ত্রীপুষ্প, অন্য গাছে কেবল পুরুষপুষ্প জন্মে। সাধারণত এই উভয় প্রকারের বৃক্ষ কাছাকাছি অবস্থান করে। পুরুষ-পুষ্পের বৃন্ত বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু স্ত্রীপুষ্পের রীতিমতো দীর্ঘ ও শীর্ণাকার বৃন্ত আছে। বৃন্তগুলি সরু ষ্টীলের পাতের স্প্রিংএর মতো পাক্-খাওয়া। সচরাচর বৃন্তগুলি পাক্ খাইয়া ফুলগুলিকে জলের তলদেশে টানিয়া রাখে। পুরুষপুষ্পগুলি বৃন্তহীন বলিয়া পরিণতিপ্রাপ্ত হইলেই কাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। সেই সময় স্ত্রীপুষ্পের বোঁটার পাক্‌গুলি খুলিয়া যায় এবং তাহারা জলপৃষ্ঠে উঠিয়া আসে। জলস্রোতে পুরুষপুষ্প ভাসিয়া ভাসিয়া স্ত্রীপুষ্পের গায়ে আসিয়া লাগে; তারপর ঈষৎ কাইৎ হইয়া পুরুষপুষ্প স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাধারে নিজের রেণু লাগাইয়া দেয়।

মিলনের পর পুরুষ-পুষ্পগুলি ভাসিতে ভাসিতে অন্যত্র চলিয়া যায় ও শুকাইয়া যায়। স্ত্রী-পুষ্পের স্ত্রিবৎ বৃন্ত পুনরায় গুটাইয়া ফুলকে জলের তলায় টানিয়া লয়। তথায় স্ত্রীপুষ্পের বীজকোষ পরিপক্ক হইয়া ফলাকার ধারণ করে, ও পুষ্ট বীজ হইতে যথাসময়ে নূতন গাছের জন্ম হয়।

যৌনধর্ম্মের দৈহিক বৈশিষ্ট্য

অধিকাংশ সামুদ্রিক জীব, মৎস্য, কাঁকড়া, বিছা, শম্বুক, গুগ্‌লি প্রভৃতি ও কয়েক শ্রেণীর ক্ষুদ্রকায় পক্ষীর আকৃতি দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই—কোন্‌টি স্ত্রী, কোন্‌টি পুরুষ। ইহাদের অনেকেরই যৌনযন্ত্র এত ছোট যে, সাধারণ লোকের পক্ষে খুঁজিয়া বাহির করা সুকঠিন। কেবল ইহাদের শরীর-ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখা যায় যে, একটির মধ্যে অণ্ডাশয় (ovaries), অন্যটির মধ্যে মুক্ত (Testes) রহিয়াছে; তখনি ইহাদের সঠিক যৌনধর্ম (sex) জানা যায়। স্ত্রীপ্রাণীর অণ্ডাশয়ে কেবল অণ্ডাণু (ova) প্রস্তুত এবং পুরুষপ্রাণীর মুষ্কে শুধু শুক্রকীটাণু প্রস্তুত হয়। অণ্ডাণুর সহিত শুক্রকীটের মিলন সাধন ও তদ্দ্বারা প্রাণীর বংশধারা রক্ষণের জন্যই প্রকৃতিকে দুইটি পৃথক যৌনযন্ত্রের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে।

উচ্চস্তরের প্রাণী-রাজ্যে পৌঁছিয়া আমরা শুধু যৌনযন্ত্র দেখিয়া নহে, বাহ্য আকৃতি দর্শনে সহজেই যৌনধর্ম্মীর স্বরূপ বুঝিতে পারি। মৃগ ও মৃগী, বাঘ ও বাঘিনী, ষণ্ড ও গাভী, বানর ও বানরী, মানব ও মানবীর আকারে অল্পবিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। স্ত্রী-পুরুষের এই বাহ্যাভ্যন্তরিক বৈষম্যগুলি শরীরের ভিতরকার কয়েকটি বিশেষ যন্ত্রের কার্যকারিতায় সম্ভবপর হয়; তাহা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

পক্ষিকুলের স্ত্রী-পুরুষ

এক এক জাতীয় প্রাণীর উভয় যৌনধর্ম্মীর পরস্পরের মধ্যে এত আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকে যে, দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। দোয়েল, টিয়া, মোরগ, ময়ূর ও অন্যান্য কয়েক সম্প্রদায়ের পক্ষীর মধ্যে এইরূপ পার্থক্য অত্যন্ত বেশি করিয়া ধরা পড়ে। পুরুষ-দোয়েলের পালকের রঙ্ চক্‌চকে কালো, তলপেটের পালকগুলি সাদা; পুচ্ছে ও ডানায় কালো রঙের সাদা সাদা দাগ থাকে। স্ত্রী-দোয়েলদিগের গায়ের পালক ধূসর রঙের। প্রত্যেক পুরুষ-টিয়ার গলায় একটী কণ্ঠী আঁকা অর্থাৎ গলার উপরকার অংশে গোলাপী ও নিম্নাংশে কালো রঙের বেড়্ দেওয়া থাকে। মোরগের মস্তকে লাল ঝুঁটি, মুর্গীর মাথা নেড়া। প্রথমোক্তের গলায় লাল পাৎলা মাংসের দুই টুক্‌রা ঝালর ঝুলে, মুর্গীর গলায় তাহা একেবারেই নাই। পুরুষের পাখা নানা বর্ণে রঞ্জিত, মুর্গীর পাখা সাধারণত একই রঙের হয়। যে সকল পক্ষীর গলার স্বর শুনিয়া আমরা মুগ্ধ হই, তাহারা প্রায় সকলেই পুরুষজাতীয়; স্ত্রী পক্ষীর গলার স্বর অত্যন্ত কুৎসিত।

পুরুষের দৈহিক শক্তি ও সৌন্দর্য

বহু জাতীয় প্রাণীর পুরুষদিগের দৈহিক শক্তি ও সৌন্দর্য স্ত্রীগণ অপেক্ষা অধিক দেখা যায়; কেবল গর্ভধারণের পূর্বে ও পরে তাহাদের শক্তি, সাহস ও খাদ্য-পরিপাক করিবার ক্ষমতা স্পষ্টত বৃদ্ধি পায়। নানা দেশীয় আদিম মনুষ্যদের মধ্যেও এইরূপ প্রাকৃতিক পক্ষপাতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। সৃষ্টির মধ্যবর্তী অবস্থায় অথবা মানব সভ্যতার মধ্যযুগে নারীর শারীর সৌন্দর্য পুরুষ অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। বর্তমান যুগে উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিরাণী একটা সমতা বিধানের চেষ্টা করিতেছেন, অর্থাৎ

দৈহিক সৌষ্ঠবের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সমানভাবে উভয় যৌনধর্মীর মধ্যে বণ্টনের করিবার প্রয়াস চলিতেছে।

পুরুষের গঠন-সৌন্দর্য ও গুণগত স্বালক্ষণ্য সৃষ্টির প্রধান কারণ—তাহাদিগকে স্ত্রীজাতির নিকট আকর্ষণযোগ্য ও বরণীয় করিয়া তোলা। নাচিয়া, সুমিষ্ট স্বর ভাঁজিয়া, গান গাহিয়া, শত্রু-দমনে বা শিকার-সংগ্রহে নিজের বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়া পুরুষ স্ত্রীজাতির কামনা জাগায়, নিজেকে তাহার নিকট প্রেয় করিয়া তোলে। ইহাই হইল যৌন আকর্ষণের মূল কথা, এবং উহা নিম্নপ্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম জীবের মধ্যে বংশ-পরম্পরায় বিবর্তিত হইয়া আসিতেছে। এই বৈষম্য ও আকর্ষণ না থাকিলে, স্ত্রী-পুরুষের যৌনসম্মিলন দুঃসাধ্য ও সৃষ্টিপ্রবাহ চিরচলমান রাখা কষ্টকর হইয়া পড়িত।

কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে পুরুষজাতিকে অত্যন্ত দুর্বল ও অল্পায়ু করিয়া গঠন করা হইয়াছে। স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষ-মাকড়সা অপেক্ষা বহুগুণ বলবতী। পুরুষ-মাকড়সাকে দিয়া গর্ভাধান করাইয়াই স্ত্রী-মাকড়সা তাহাকে মারিয়া ফেলে। আবার এক জাতীয় বাণ মাছ আছে, তাহাদের পুরুষগণ স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধিককাল বাঁচে; স্ত্রীগণ একবার ডিম্ব প্রসব করিয়াই মারা পড়ে। পাশ্চাত্যদেশের স্যামন্ ও আমাদের দেশের কয়েক সম্প্রদায়ের স্ত্রী-মাছেদেরও পরমায়ু অপেক্ষাকৃত অল্প; একবার, দুইবার বা তিনবার ডিম পাড়িয়াই তাহারা জীবলীলা সম্বরণ করে।

অণ্ডাণু ও শুক্রকীটাণুর সংযোগ-সাধন

এক্ষণে বহুকোষাণুযুক্ত প্রাণীদের যৌন পদ্ধতিতে কিভাবে প্রজনন হয়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব।

এককোষাণুবিশিষ্ট প্রাণীর ক্ষেত্রে যেরূপ একটি কোষাণুই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়, বহু কোষাণুবিশিষ্ট প্রাণীর ক্ষেত্রে কিন্তু অন্যরূপ বন্দোবস্ত। মাতার একটি অণ্ডাণু ও পিতার একটি শুক্রকীটাণু (উভয়েই এককোষাণুময়) মাতৃদেহের স্থলবিশেষের মধ্যে একত্র সংযুক্ত হয়। বলা বাহুল্য, স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম ব্যতীত এই দুইটি কোষাঙ্কুরকের মিলন সংঘটনের সুযোগ হয় না। মানুষ ও অন্যান্য সকল প্রাণীর শুক্রকীটাণু একটি সূক্ষ্মদেহী ব্যাঙাচি বা সর্পশিশুর ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, চক্ষুর অগ্রাহ্য, কিন্তু চলচ্ছক্তিমান। স্ত্রীদিগের অণ্ডাণু চ্যাপ্টা, চাকৃতির ন্যায় আকৃতিসম্পন্ন, শুক্রকীটাণু অপেক্ষা অন্তত চারিগুণ বড়, তথাপি এত ক্ষুদ্রকলেবর স্থূলচক্ষে দেখিতে পাওয়া অতিশয় কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে শুক্রকীটাণু ও অণ্ডাণুর আয়তন বা আকৃতির একটু-না-একটু তারতম্য হয়; কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি সর্বক্ষেত্রে একইরূপ।

প্রত্যেক পুংপ্রাণীরই শরীরের একটা বিশিষ্ট অংশে ও যৌনেন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী স্থলে একটা আভ্যন্তরিক যন্ত্রের মধ্যে অসংখ্য শুক্রকীটাণু জন্মগ্রহণ করে এবং একপ্রকার বিশিষ্ট স্থানীয় রসে সংরক্ষিত থাকে। স্ত্রীজাতিরও একটা আভ্যন্তরিক যন্ত্র হইতে প্রায়শ একসময়ে একটি করিয়া (প্রাণিবিশেষে—কয়েকটি করিয়া) অণ্ডাণু পরিপক্ক অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া যোনিনালীর নিকটে কোথাও অবস্থান করে। আমরা পরের এক অধ্যায়ে জনন-যন্ত্রাবলীর পরিচয় ও গর্ভাধান পদ্ধতির বিবৃতি-প্রসঙ্গে এই সকল যন্ত্রগুলির নাম, সংস্থান ও কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করিব।

সঙ্গমের পর পুরুষের বীর্যনিষেকের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক লক্ষ শুক্রকীটাণু স্ত্রীজীবের যোনিনালীর মধ্যে প্রবেশ করে, এবং অনুকূল ক্ষেত্র পাইলে, একটি শুক্রকীটাণু একটি অণ্ডাণুর সম্মুখীন হইয়া, তাহার কোমল মৌলধাতুর মধ্যে নিজের মাথাটিকে প্রোথিত করিয়া দেয়। শুক্রকীটাণুর পুচ্ছটির কতকাংশ কিছুক্ষণ বাহিরে থাকিয়া ঈষৎ স্পন্দিত হইতে থাকে। তারপর যে মুহূর্তে তাহার মস্তকটি অণ্ডাণুর প্রাণবিন্দুর সহিত সংযুক্ত হয়, সেই মুহূর্তে তাহার পুচ্ছটিও সঙ্কুচিত হইয়া অণ্ডাণু-

গাত্রের সহিত মিশিয়া যায়। শুক্রকীটাণুর মস্তকটি প্রাণবিন্দুময় ও পুচ্ছটি মৌলধাতুময়। সুতরাং উভয়ের প্রাণবিন্দুতে ও মৌলধাতুতে যখনই অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলন হয়, তখনই জীবাঙ্কুরের সৃষ্টি—নব জীবনের সূত্রপাত হয়।

মিলনের পরেই এই যুক্ত কোষাণুঙ্কুরকের দেহের চারিপার্শ্বে একটা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও স্থূল পর্দা আপনা-আপনি তৈয়ারি হইয়া যায়; উহার নাম 'কুসুম-ঝিল্লী' (Vitellus membrane). ইহার দুইটি উদ্দেশ্য;—প্রথমত, জীবাঙ্কুর-দেহে যাহাতে সম্পূর্ণ অনাবশ্যকভাবে অন্য কোন শুক্রাণু আসিয়া প্রবেশ করিতে না পারে; দ্বিতীয়ত, জীবাঙ্কুরের কোমল গাত্র বাহিরের সর্বপ্রকার আঘাত বা অভিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। তারপর জীবাঙ্কুর গর্ভগাত্রে প্রোথিত হইয়া, ধীরে ধীরে স্ববিচ্ছেদন-ক্রিয়া দ্বারা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহা বিশদভাবে পরে বলিব।

বংশরক্ষার আয়োজনে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদিগের বংশতি-বিস্তারে যত প্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকিতে পারে—তাহার বিধান করিয়া দিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের দেহে এত বেশি সংখ্যক কোষাঙ্কুরক প্রস্তুত হয় যে, নানাভাবে বিনষ্ট হইয়াও যাহা থাকে, তদ্বারা একজোড়া স্ত্রীপুরুষ হইতে বহুতর বংশধরের উৎপত্তি হইতে পারে। মৎস্যকুল এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান। পায়রা-চাঁদা শ্রেণীর মৎস্য বৎসরে কম করিয়া ৯০,০০,০০০ করিয়া ডিম পাড়ে; কড্ মৎস্য ৬০,০০,০০০ করিয়া। পুরুষ-মৎস্যের শুক্রাণুর সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; তবে ইহা সত্য যে, অণ্ডাণুর সংখ্যা অপেক্ষা প্রাণিদেহে ইহাদের সংখ্যা বহুগুণ বেশি।

এক এক জাতীয় পতঙ্গ একই সময়ে দেড়শত হইতে চারিশত ডিম্ব প্রসব করে; বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে প্রচুর আহার্য পাইলে কোন কোন শ্রেণীর পতঙ্গ দিনের মধ্যে চারিবার প্রসব করিতে পারে।

উচ্চতর প্রাণীর অণ্ডাণু ও শুক্রাণু

উচ্চতর প্রাণিকুলের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনাতিরিক্ত কোষাঙ্কুরের

আয়োজন করিতে প্রকৃতি কার্পণ্য করে নাই। জাতিবিশেষে প্রত্যেক স্ত্রীজীবের দেহের মধ্যে সঞ্চিত থাকে কুড়ি হইতে আটহাজার অপরিপক্ক অণ্ডাণু। সারা জীবনকালের মধ্যে ইহার অতি অল্প এক অংশই পরিপক্ক হয় এবং তদপেক্ষা আরো ন্যূন সংখ্যক অণ্ডাণু পুরুষের শুক্রাণুদ্বারা নিষিক্ত হইবার সুযোগ পায়। মস্তুকুলের স্ত্রীজাতির দুইটি অণ্ডাশয়ে (ovaries) কিছু কম-বেশি আট হাজার অপরিণত অণ্ডাণু দাড়িম্ববীজের ন্যায় বিন্যস্ত থাকে। প্রতি চান্দ্রমাসে একটি করিয়া (কচিৎ দুইটি) অণ্ডাণু পরিণতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সমগ্র জীবনকালের মধ্যে কোনক্রমে পাঁচশতের বেশি পরিণত হয় না। এই সংখ্যার কুড়ি হইতে পঁচিশ ভাগের এক ভাগের অধিক সংখ্যক অণ্ডাণু কখনো পুরুষের শুক্রকীটাণুর সহিত যুক্ত হইবার অবসর পায় না। অর্থাৎ প্রায় কোনো স্ত্রীলোকেরই এক জীবনে পঁচিশটির বেশি সন্তান হইতে দেখা যায় না। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি সন্তানের জননী এযাবৎ জগতে অতি অল্প সংখ্যকই পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

এই তো গেল নারীদেহজাত অণ্ডাণুর কথা। প্রত্যেক পুরুষের দেহে কতগুলি শুক্রকীটাণু জন্মিতে পারে, তৎসম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা সম্প্রতি জীববৈজ্ঞানিকগণ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক একবার স্ত্রী-সঙ্গমে পুরুষের গড়্পড়তা কত গ্র্যাম্ শুক্র নির্গত হয় এবং তাহার মধ্যে কত লক্ষ শুক্রকীটাণু থাকে, তাহার একটা হিসাব বাহির হইয়া গিয়াছে। নির্ণীত হইয়াছে যে, নারীর প্রতেকটি অণ্ডাণুর জন্য পুরুষের ৮৫,০০,০০,০০০ শুক্রকীটাণু বর্তমান থাকে।

আমরা দেখিতে পাই যে, মৎস্যজাতির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম দ্বারা প্রজা-সৃষ্টির প্রথা নাই। স্ত্রীমৎস্য তাহার দেহমধ্য হইতে একত্রে কয়েক সহস্র অর্ধকঠিন ও পিণ্ডাকার অণ্ডাণু নিষ্কাশিত করিয়া জলে ভাসাইয়া দেয়। তারপর পুরুষমৎস্য আসিয়া স্বাভাবিক প্রেরণা-বশে আপন দেহমধ্য হইতে শুক্র নিঃসারিত করিয়া, ঐ অণ্ডাণুপিণ্ডের সর্বাঙ্গে সংলিপ্ত করিয়া দেয়। এইভাবে পরস্পর সংযুক্ত কয়েক সহস্র অণ্ডাণু ও শুক্রাণু (জীবাঙ্কুর) জলস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ও সূর্যালোক-সংস্পৃষ্ট

হইয়া, কোষাণু-বিচ্ছেদন দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে থাকে। এইরূপে গর্ভের বাহিরে জলের উপরেই কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক দিনের মধ্যে মৎস্যজাতির ভ্রূণ বিকশিত হয় ও মৎস্যশিশু জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তৎপূর্বে অধিকাংশ নিষিক্ত অণ্ড অন্যজাতীয় মৎস্য, জলকীট, অতিরিক্ত বৃষ্টির কবলে পড়িয়া বিনষ্ট হয়।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বাস

কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের যৌন-সংযোগ না হইলে জীবাঙ্কুর গঠিত হওয়া অসম্ভব। ইহাতে প্রজনন-ক্রিয়া অধিকতর নিশ্চিত ও অপেক্ষাকৃত অল্প অপব্যয়মূলক হইয়াছে। তদুপরি ভাবীবংশধরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অধিকতর পুষ্ট করিয়া গঠন ও তাহার পরমুখাপেক্ষিতার মিয়াদ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য মাতৃগর্ভে কিছুকাল ভ্রূণগঠন ও রক্ষণের ব্যবস্থা হইল।

কীট, পতঙ্গ, পক্ষী ও সরীসৃপকুলের জীবাঙ্কুর মাতৃগর্ভের মধ্যে থাকিয়া, তাহার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেহের চতুষ্পার্শ্বে একটি কঠিন আবরণ সৃষ্টি করিয়া লয়। মনুষ্যের সদ্যনিষিক্ত জীবাঙ্কুরের চতুর্দিকে যেমন কুসুম-ঝিল্লীর সৃষ্টি হয়, এই খোলাটি কতকটা তাহারই অনুরূপ। জীবাঙ্কুরও বৃদ্ধি পায়, খোলাও তদনুপাতে বৃদ্ধি পায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ভ্রূণের যাহা কিছু পুষ্টির উপাদান, তাহা খোলার মধ্যেই থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ান্তে ডিমগুলি মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসে, এবং মাতার দেহতাপ বা কৃত্রিম উত্তাপ পাইয়া খোলা ভাঙিয়া শাবক নির্গত হয়।

কিন্তু স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণ-পুষ্টির ব্যবস্থা অন্যরূপ। অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় তাহাদেরও জীবাঙ্কুর স্ববিচ্ছেদন-প্রথায় ক্রমপুষ্ট হয় বটে; কিন্তু খোলার মধ্যে নহে—জরায়ু নামক একটা বিশিষ্ট আধারের মধ্যে। প্রত্যেক প্রাণীরই জীবাঙ্কুরের মধ্যে থাকে সমসংখ্যক মাতৃজাতীয় ও পিতৃজাতীয় বর্ণশুদ্ধ (Chromosomes). ইহারাই পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সাধারণ ও অসাধারণ চরিত্রের বীজবাহক।

—•—